ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে। তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না’ *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
৩০তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২৬



আক্রান্ত সঊদী আরব : নিরাপত্তা সংকটে পবিত্র নগরী

মুসলিম বিশ্বের করণীয়

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٣٠ العدد : ٢، جُمادى الأولى و جُمادى الآخرة ١٤٤٨هـ/ نوفمبر ٢٠٢٦
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর ৫টি বই



শিশু শ্রেণীর ৫টি বই



প্রথম শ্রেণীর ৮টি বই সমূহ



দ্বিতীয় শ্রেণীর ৯টি বই



তৃতীয় শ্রেণীর ১০টি বই



চতুর্থ শ্রেণীর ১২টি বই



পঞ্চম শ্রেণীর ৫টি বই



অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ



বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

আরবী ব্যাকরণ বিষয়ক ৪টি বই



মীযানুছ ছরফ | তামরীনুছ ছরফ | তাকমীলুছ ছরফ | আমীনুন নাহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫-৯৫৮৮২২।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০ | hadeethfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩০তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

জুমাঃ উলা-জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪৮ হি.

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাং

নভেম্বর ২০২৬ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200 00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
  (সকাল ৯-টা থেকে ১-টা এবং বিকাল ৪-টা থেকে ৬-টা পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা | সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - হিংসা-হানাহানি নয়, মানবিক পৃথিবী গড়ার আহ্বান ০২
- **অহির আলো :**
  - যুদ্ধে মানবাধিকার নীতি *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ০৩
- **প্রবন্ধ :**
  - ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি *(৩য় কিস্তি) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ০৪
  - মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা : গুরুত্ব, ফযীলত ও সীমারেখা *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ০৭
  - আমরা কেন ভুলে যাই : বিস্মৃতির মনোবৈজ্ঞানিক কারণ *-ড. তরুণ হাসান* ১৪
  - নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা : পরকালীন জীবনের অনন্য পাথেয় *(২য় কিস্তি) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৭
  - যুগে যুগে শী'আদের অপতৎপরতা *(২য় কিস্তি) -মুজাহিদুল ইসলাম* ২৪
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - আক্রান্ত সঊদী আরব : নিরাপত্তা সংকটে পবিত্র নগরী, মুসলিম বিশ্বের করণীয় *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২৯
- **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  - ন্যায়বিচারের অমর কাহিনী *-ড. নূরুল ইসলাম* ৩১
- **আত্মচিন্তা :** ▶ সমালোচনার মজলিস *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩২
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - আদর্শ সন্তান গঠনে পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায় *(গত সংখ্যার পর) -মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম* ৩৪
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ▶ কাগজের ফুল *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৮
- **স্বাস্থকথা :**
  - মৌসুমী ভাইরাসজনিত জ্বর : আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতা ও সঠিক যত্ন *-ডা. মেহেদী হাসান মুনিম* ৪১
- **কবিতা :** ▶ পরনিন্দাকারী ▶ নিখোঁজপত্র ▶ কার হুকুমে ▶ নফসের দিনলিপি ▶ হ'তে হবে সেরা ৪২
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

হিংসা-হানাহানি নয়, মানবিক বিশ্ব গড়ার আহ্বান

বর্তমানে আমরা এমন এক সংকটাপন্ন সময়ে বাস করছি, যেখানে পৃথিবীর এক প্রান্তের ক্ষত অন্য প্রান্তে রক্ত ঝরাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে হিংসাত্মক রাজনৈতিক সংঘাত, ইসলামী দলগুলোর বিভক্তি ও লক্ষ্যহীনতা, মধ্যপ্রাচ্যে পরাশক্তিগুলোর আধিপত্যের লড়াই, ইউক্রেনে দীর্ঘায়িত যুদ্ধ এবং ইউরোপের রাজপথে উগ্র অভিবাসী বিদ্বেষ। প্রতিটির প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও সবকিছুর মূলে রয়েছে একটি অভিন্ন ও নির্মম সত্য। আর তা হ'ল, মানুষের জান-মাল-ইযযত ও মৌলিক নিরাপত্তা আজ ক্ষমতা, আধিপত্য আর ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থের কাছে অতীব সস্তা পণ্যে পরিণত হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট তথা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর জাতির সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল, হিংসা ও প্রতিহিংসার দুষ্টচক্র ভেঙে একটি নিরাপদ, সহনশীল ও মানবিক রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল, ফেলে আসা হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি থামেনি; বরং আহত-নিহত ও চাঁদাবাজদের পরিচয় বদলেছে মাত্র। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী-জুন ২০২৬) অনুযায়ী, বিগত ছয় মাসে দেশে ৮৩০টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ৫৬ জন নিহত এবং ৫,২৪৬ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। যার ৮১ শতাংশ ঘটনাই ঘটেছে ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্কলহ ও অপরাপর রাজনৈতিক দলের মুখোমুখি সংঘাতের কারণে। নির্বাচনকেন্দ্রিক ৩৯৬টি ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও ২,৫৭৮ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে ১৪৪টি মামলায় ২৪,৫১৮ জনকে 'অজ্ঞাতনামা' আসামী করে হয়রানির পুরনো রীতি বজায় রাখা হয়েছে। এইচআরএসএসের অপর এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ১৭ মাসে মব সন্ত্রাসে নিহত হয়েছেন অন্তত ২৫৯ জন। রাজপথের এই অশুভ সংঘাত ও আইনের চরম অপপ্রয়োগ মূলত একইসাথে নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মধ্যপ্রাচ্যের চিত্র আজ ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। ২০২৬ সালে মার্কিন-ইস্রাঈল বনাম ইরান যুদ্ধ হরমুয প্রণালীকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক জ্বালানি-নিরাপত্তাকে চরম ঝুঁকিতে ফেলেছে। জুলাইয়ে চার বছরের যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর ইরান-সমর্থিত হূতি বিদ্রোহীরা সঊদী আরবের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ ঘোষণা করেছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর রিয়াদে তাদের প্রথম হামলার দাবী আসে। যাতে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সংলগ্ন জ্বালানি ডিপোতে আগুন ধরে যায়। ১০ই অক্টোবর একই বিমানবন্দরের একটি টার্মিনালে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত ও ৩০০-এর অধিক মানুষ আহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পরবর্তী প্রতিবেদনগুলোতে সঊদীর পাঁচটি বিমানবন্দরে হামলায় মোট নিহতের সংখ্যা ১৯ ও আহতের সংখ্যা ৩৬৪ বলা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন বাংলাদেশী। আহত হয়েছেন আরও ২৪ বাংলাদেশী, যাদের ১৩ জন ওমরাহ যাত্রী এবং ১১ জন প্রবাসী কর্মী। কয়েকজন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। এসব হামলায় বাস্তবতা হ'ল-আজ মুসলিম ভূখণ্ডে মুসলিমের হাতেই মুসলিমের রক্ত ঝরছে, আর এর পূর্ণ সুবিধা হাছিল করছে অমুসলিম পরাশক্তিগুলো। এটি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক মহাসংকট।

এই অশুভ বিভাজনের ছায়া আজ দেশের ইসলামপন্থী অঙ্গনেও সুগভীর। নেতৃত্ব, পদ-পদবী, দাওয়াতী কৌশল ও চিন্তাধারা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু মতপার্থক্যকে আত্মবিনাশী শত্রুতায় রূপ দেওয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ছড়ানো কিংবা ব্যক্তি স্বার্থে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ন্যূনতম জায়গাটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা শক্তিহীন হবে ও তোমাদের প্রতিপত্তি উবে যাবে' *(আনফাল-মাদানী ৮/৪৬)*। এই ঐক্য মানে মোটেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য মুছে ফেলা নয়; বরং সত্যের অনুসরণে পরস্পরকে সহযোগিতা করা, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে দলীল ও ইসলামী শিষ্টাচার বজায় রাখা এবং উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণকে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। ইসলামী নেতৃত্বের মর্যাদা প্রতিপক্ষকে ছোট বা পরাজিত করার মধ্যে নয়; বরং মানুষকে চিরন্তন সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার মধ্যেই নিহিত।

ইসলাম মানবজীবনের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কারু প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে' *(মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫)*। অতএব, ধর্মীয় পরিচয় কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থের অজুহাতে কোন অন্যায়কে বৈধতা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং সার্বজনীন সহমর্মিতা ও দয়ার পথনির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯, সনদ ছহীহ)*।

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

পূর্বের ন্যায় বর্তমানে দেশের নির্বাচিত নেতারা পুনরায় পূজা মণ্ডপে যাচ্ছেন এবং বলছেন, 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। অথচ ইসলাম বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(মায়েদাহ ৩)*। ইসলামে মূর্তিপূজার কোন স্থান নেই। তাই নেতাদের আদৌ সমীচীন নয় অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে গিয়ে তাদেরকে শিরকী কাজে উৎসাহিত করা। বরং উচিত হবে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া এবং জনকল্যাণে বিশেষ করে সর্বস্বহারা নদী ভাঙা লোকদের হৃদয়ের কান্না শোনা। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, রাম কেবল মহাকাব্যে আছেন'। বাস্তবে নেই।...'দূর্গা অনুরূপ একটা ভিত্তিহীন বিশ্বাস মাত্র। ঋগ্বেদে যার কোন উল্লেখ নেই' *(কলিকাতা, দৈনিক আনন্দবাজার, ৯ই নভেম্বর ২০১৯)*। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হ'ল ইসলাম। আর ইসলামে ধর্মের ব্যাপারে কারুর প্রতি কোন যবরদস্তি নেই *(বাক্বারাহ ২৫৬; স.স.)*।

যুদ্ধে মানবাধিকার নীতি

-আত-তাহরীক ডেস্ক

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ-

‘তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে। তবে এতে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না’ *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, রক্তপাত আর আর্তনাদ। বিজয়ী শক্তির দাম্ভিকতায় যুগে যুগে পদদলিত হয়েছে মানবতা, লুণ্ঠিত হয়েছে সম্মান। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে, আইয়ামে জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে ইসলাম এক অভূতপূর্ব ও মানবিক যুদ্ধের নীতিমালা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ বিধান নাযিল করেছেন, যা যুদ্ধক্ষেত্রেও মানবাধিকারের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছে।

আয়াতের শানে নুযূল ও প্রেক্ষাপট :

মক্কায় সুদীর্ঘ ১৩ বছর মুসলিমরা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু তাদের তরবারি উত্তোলনের অনুমতি ছিল না। মদীনায় হিজরতের পর যখন মক্কার কাফেররা সেখানেও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ’ল এবং বদর প্রান্তরে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হ’ল, তখন আত্মরক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন। বিখ্যাত ছাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও প্রখ্যাত তাবেঈ রবী‘ ইবনে আনাস (রহঃ) -এর মতে, শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দিয়ে অবতীর্ণ এটিই পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত *(নাসাঈ হা/৩০৮৫)*।

হুদায়বিয়া সন্ধির পরের বছর ৭ম হিজরীতে গত বছরের চুক্তি অনুযায়ী ওমরাহ পালনের জন্য যখন মুসলমানগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন অনেকে আশংকা প্রকাশ করেন যে, কাফেররা চুক্তি ভঙ্গ করে হামলা করতে পারে। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় *(কুরতুবী)*।

ব্যাখ্যা :

আয়াতটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী অংশ হ’ল যুদ্ধের আদেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে, ‘তবে (যুদ্ধের ক্ষেত্রে) সীমালংঘন করো না’। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের রক্ত গরম থাকাই স্বাভাবিক। প্রতিশোধের আগুনে অন্ধ হয়ে যাওয়াটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এখানেই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। আল্লাহ মুমিনদেরকে যুদ্ধের ময়দানেও চরম সংযম ও নৈতিকতার পাঠ দিয়েছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করো, তবে তাতে সীমালঙ্ঘন করো না। হাসান বাছরী (রহঃ)-এর মতে, এর মধ্যে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মৃতদেহ বিকৃত করা, গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করা, নারী, শিশু, বৃদ্ধ (যাদের যুদ্ধে কোন অংশগ্রহণ নেই), সাধক ও উপাসনালয়ের অধিবাসীদের হত্যা করা এবং কোন কারণ ছাড়াই গাছপালা জ্বালিয়ে দেওয়া ও প্রাণী হত্যা করা *(ইবনু কাছীর ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতিটি যুদ্ধে উক্ত পদক্ষেপ প্রতিফলিত হয়েছে। হাদীছের এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন, তখন কঠোরভাবে নির্দেশনা দিতেন, বলতেন, اُخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ لاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ- ‘তোমরা আল্লাহ্র নামে বের হও! তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করো না, খেয়ানত করো না, নিহত ব্যক্তির অঙ্গ ছেদন করো না, শিশুদের ও গীর্জার পূজারীদের হত্যা করো না’ *(আহমাদ হা/২৭২৮, সনদ হাসান-আরনাঊত্ব; বায়হাক্বী হা/১৮৬১৮)*।

ইসলামের প্রথম খলীফা আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) সিরিয়ায় সেনাদল পাঠানোর সময় যে ঐতিহাসিক দশটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তা এই আয়াতেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা উপাসনালয়ে এমন কিছু মানুষকে পাবে, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে ইবাদতে মগ্ন আছে, তাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেবে। কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, জনপদ বিরান করবে না এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করবে না...’। আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত মানবাধিকার সনদ খ্যাত জেনেভা কনভেনশনও ইসলামের এই মহানুভবতার শিক্ষার ধারে-কাছেও নেই।

শিক্ষণীয় দিকসমূহ :

১. লড়াই হবে কেবল সত্যের পথে : আয়াতে ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ (আল্লাহ্র পথে) কথাটি যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের যুদ্ধ কোন রাজ্য বিস্তার, সম্পদ লুণ্ঠন বা দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য নয়। এই লড়াই স্রেফ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে নয়। এ লড়াই কেবল যুলুমের অবসান এবং আল্লাহ্র যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য।

২. নিরপরাধের সুরক্ষা : যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করেনি, যুদ্ধক্ষেত্রে তার গায়ে একটি আঁচড় পড়াও ইসলাম সমর্থন করে না। এটি ইনছাফ ও মানবাধিকারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

৩. আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ : মুমিন কখনো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে অন্ধ হয় না। সে সর্বদা আল্লাহ্র ভালোবাসার কাঙাল। তাই সে জানে, সীমালংঘন করলে সে আল্লাহ্র দয়া ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. যুদ্ধ হবে যাদের সাথে : অত্র আয়াতে আরেকটি মৌলিক নীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ কেবল তাদের সাথে হবে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে।

উপসংহার :

সূরা বাক্বারাহ-এর এই আয়াতটি কেবল একটি আইনী নির্দেশিকা নয়; বরং এটি হ’ল মানবাধিকারের এক অমর ঘোষণাপত্র। আজ বিশ্বজুড়ে যখন যুদ্ধের নামে নারী, শিশু ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে হোলি খেলা হচ্ছে, তখন ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ এই আয়াতটি বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সত্যিকারের শান্তি ও ইনছাফ কেবল ইসলামই দিতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত আয়াতের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং আল্লাহ প্রেরিত নূর তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৩য় কিস্তি)

৩. এলোমেলো প্রকরণ ও রূপান্তর (Random Variation & Mutation) : ডারউইনের যুগে ডিএনএ (DNA) বা জিনতত্ত্বের কোন ধারণাই ছিল না। তিনি কেবল নিজস্ব পর্যবেক্ষণে দেখেছিলেন যে, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু শারীরিক পার্থক্য বা বৈচিত্র্য থাকে, যাকে তিনি 'এলোমেলো প্রকরণ' (Random Variation) বলতেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীর শংকরায়ণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, এ প্রক্রিয়ায় অধিক উৎপাদনশীল গরু উৎপন্ন হচ্ছে। এই সামান্য কিছু নিদর্শন দেখে তিনি ধারণা করেন যে, এভাবে ক্রমাগত একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে থাকতে থাকতেই কোন প্রজাতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়।[১]

পরবর্তীকালে বিবর্তনবাদীরা জিনতত্ত্বের আবিষ্কারের পর এটিকে ডারউইনবাদের সাথে যুক্ত করে নাম দেয় 'র‍্যান্ডম মিউটেশন' (Random Mutation) বা এলোমেলো রূপান্তর। তাদের দাবী, ডিএনএ অনুলিপন (Replication) করার সময় ভুলবশত বা এলোমেলোভাবে ঘটা মিউটেশনই প্রাণীর মধ্যে নতুন নতুন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরির মূল ইঞ্জিন এবং এই প্রক্রিয়ায় নতুন তথ্য তৈরি হয় এবং জীবন বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ হয়। অথচ আধুনিক আণবিক জীববিজ্ঞান (Molecular Biology), জিনতত্ত্ব এবং তথ্যের আলোকে 'র‍্যান্ডম মিউটেশন' বা আকস্মিক রূপান্তরের এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব বলে প্রমাণ করেছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রথমত- কোষের বিস্ময়কর জটিলতা : মূলত ডারউইনের সময়ে যে অনুন্নত মাইক্রোস্কোপ ছিল, তাতে জীবদেহের প্রতিটি কোষকে কেবল এক একটি সাধারণ প্রকোষ্ঠ ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর কোষের যে অবিশ্বাস্য জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে, তা বিবর্তনবাদের মূল ভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধসিয়ে দিয়েছে।[২]

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, জীবদেহের প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম থাকে, যার সংখ্যা বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রকম (যেমন : মানবদেহে ২৩ জোড়া)। এই ক্রোমোজোমই উত্তরাধিকারমূলক বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমে থাকে জিন, যা বংশগতির সূক্ষ্ম তথ্য ধারণ করে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের আবিষ্কার ও পরবর্তীকালের গবেষণায় একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জিনের ভেতরের মূল সংকেত (ডিএনএর কোড) যদি পরিবর্তন না হয়, তাহ'লে কোন জীবের মধ্যে নির্দিষ্টবৈশিষ্ট্যের বাইরে নতুন বা বড় ধরনের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।[৩]

আণবিক জীববিজ্ঞানী মাইকেল ডেন্টন তার Evolution: A Theory in Crisis গ্রন্থে লিখেছেন, আণবিক জীববিজ্ঞান জীবনের যে বাস্তবতা প্রকাশ করেছে তা অনুধাবন করতে হ'লে একটি কোষকে শতকোটি গুণ বড় করে দেখতে হবে। যতক্ষণ না তা এত বড় হয় যে, ২০ কিলোমিটার ব্যাস ধারণ করে এবং গোটা লন্ডন বা নিউইয়র্ক শহরকে ঢেকে দেওয়ার মত বিশাল উড়োজাহাজের আকার লাভ করে। আমরা তখন যা দেখতে পাব, তা হ'ল এক অপূর্ব নকশা ও অসমান্তরাল জটিল বস্তু। এর উপরিভাগে দেখা যাবে বিশাল মহাকাশযানের আলো-বাতাস ঢোকার জন্য ছিদ্রের ন্যায় অসংখ্য রন্ধ্র, যেগুলো অনবরত খুলছে ও বন্ধ হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান ভেতরে নেওয়া ও বাইরে বের করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমরা যদি সেই রন্ধ্রগুলোর একটিতে ঢুকতে চাইতাম, তবে দেখতে পেতাম এক সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তি আর মহা বিস্ময়কর জটিল জগৎ। সুতরাং এটি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য যে, এলোপাতাড়ি কতগুলো অন্ধ প্রক্রিয়া এমন এক জটিল ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, যার ক্ষুদ্রতম উপাদানটিও মানুষের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার বাইরে? জীবকোষের এই অতি জটিলতা 'দৈবাৎ বা আকস্মিক সৃষ্টি' হওয়ার মতবাদটি একদমই ধসিয়ে দেয়।[৪]

অতএব এলোমেলোভাবে বা দৈবক্রমে কোন প্রক্রিয়ায় এমন একটা জীবন্ত কোষ তৈরি হয়ে যাওয়ার এই মতবাদ কোনভাবেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা এগুলো এমনই সূক্ষ্ম মেশিনের মত কাজ করে, যা নিজে থেকে এলোমেলোভাবে তৈরি হওয়া অসম্ভব। কোষের ভেতরে যেসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ থাকে সেগুলো এতটাই জটিল ও নিখুঁতভাবে সাজানো যে, আজকের দিনের বিজ্ঞানীরাও সেগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারেন না।

অধিকন্তু, একজন মানুষের কোষে থাকা ডিএনএ এতই সুবৃহৎ এক তথ্যভাণ্ডার, যাতে সংকলিত থাকে ৯০০টি মোটা বই (প্রতিটিতে ৫০০ পৃষ্ঠা)-এর সমান তথ্য (প্রায় ৩ বিলিয়ন বেস পেয়ার)। এই বিশাল বিশ্বকোষীয় তথ্য শুধু জমা থাকলেই হয় না; এটাকে পড়তে হয় (ট্রান্সক্রিপশন), কপি করতে হয় (রেপ্লিকেশন), এবং মেরামত করতে হয়। এসব কাজ করার জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোটিন বা এনজাইম (যেমন ডিএনএ পলিমারেজ, হেলিকেজ, লাইগেজ ইত্যাদি)। আবার এই এনজাইমগুলো তৈরি করার নির্দেশনা বা কোড সেই ডিএনএ-র ভেতরেই লেখা আছে। অর্থাৎ ডিএনএ তার নিজের 'পড়া ও কপি করার যন্ত্র' নিজেই তৈরি করে। এটি এমন একটি মহাব্যবস্থা যেখানে তথ্য এবং তথ্য ব্যবহারের যন্ত্র একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। একটি ছাড়া অন্যটি কাজ করতে পারে না।[৫]

শুধু তাই নয়, একটি কোষের নিউক্লিয়াসে ডিএনএ সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় পেঁচিয়ে সংরক্ষিত থাকে। একে সুতার মত টানলে প্রায় ২ মিটার লম্বা হয়। আর আমাদের শরীরে কোটি কোটি কোষ আছে (যেসব কোষে ডিএনএ থাকে, সেগুলোর

১. Charles Darwin, *On the Origin of Species*, p. 82, 177.
২. Douglas Axe, *Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors* (Journal of Molecular Biology 301, 2000), p. 3/585–595.
৩. Walter S Sutton, *The Chromosomes in Heredity* (Biological Bulletin 4, 1903), no. 4, p. 231–251.
৪. Michael Denton, *Evolution: A Theory in Crisis* (London: Burnett Books, 1985), p. 328–342.
৫. Stephen C Meyer, *Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design* (New York: HarperOne, 2009), p. 195–215, 347–370.

সংখ্যা প্রায় ৩ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন)। এসব ডিএনএ একসাথে যুক্ত করে টেনে ধরলে মোট দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৬০০ কোটি থেকে ১৪০০ কোটি কিলোমিটার। আর পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ একজন মানুষের শরীরের ডিএনএ দিয়ে গোটা পৃথিবীকে ১.৫ লাখ থেকে কয়েক মিলিয়ন বার জড়ানো যাবে। অবাক করা তথ্য যে, এই সুবিশাল দৈর্ঘ্যের ডিএনএ আমাদের প্রতিটি কোষের অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের ভেতরে এলোমেলোভাবে ছড়ানো থাকে না; বরং অত্যন্ত চমৎকারভাবে ভাঁজ হয়ে ও পেঁচিয়ে (Chromatin Fiber/Coiled Strand) অবস্থান করে।[৬] এই যে এত বিস্ময়কর, নিখুঁত, তথ্যপূর্ণ ও জটিলতম ডিএনএ ব্যবস্থাপনা-এর মধ্য থেকে কেবল এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার ওপর ভর করে হঠাৎ কোন নতুন জীব বা অঙ্গ সৃষ্টি হওয়া আদৌ কি কোন সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব? বৃটিশ আণবিক জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক লেসলি অরগেল এজন্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'প্রোটিন ও ডিএনএ উভয়ই একই সময়ে একই জায়গায় আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হওয়া গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে একেবারেই অসম্ভব'।[৭]

দ্বিতীয়ত- অধিকাংশ মিউটেশন ক্ষতিকর : মিউটেশন মানে ডিএনএ-র গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন। সহজ করে বললে ডিএনএ হ'ল জীবের জিনগত নির্দেশিকা বই, যা A,T,G,C এই চারটি অক্ষর দিয়ে লেখা। এতে প্রায় ৩ বিলিয়ন অক্ষর থাকে। কোষ বিভাজনের সময় যখন এই ডিএনএ বইটি কপি হয়, তখন মাঝে মাঝে ভুল হয়। একটি অক্ষর বদলে যায়, মুছে যায় বা বাড়তি ঢুকে যায়। এই ভুল বা পরিবর্তনকেই মিউটেশন বলে। নব্য-ডারউইনবাদীরা মনে করে যে, ডিএনএ কপি হওয়ার সময় এই ভুলগুলোর কারণেই প্রাণীদের মধ্যে নতুন নতুন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়।

মূলত, বিজ্ঞানীরা মিউটেশনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন- (১) ক্ষতিকর মিউটেশন (Deleterious) : অধিকাংশ মিউটেশনই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ক্যান্সার, বিভিন্ন জিনগত রোগ বা দেহের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার পেছনে এই ক্ষতিকর মিউটেশনগুলোই দায়ী। (২) নিরপেক্ষ মিউটেশন (Neutral) : কিছু মিউটেশন ঘটে ঠিকই, কিন্তু তাতে শরীরের ভালো বা মন্দ, কোন ধরনের পরিবর্তনই হয় না। (৩) উপকারী মিউটেশন (Beneficial) : এই ধরনের মিউটেশন অত্যন্ত বিরল।[৮] নব্য-ডারউইনবাদীদের দাবী এই বিরল মিউটেশনই নাকি বিবর্তনের প্রধান কাঁচামাল বা চালিকাশক্তি। অথচ আধুনিক গবেষণা বলছে ঠিক তার উল্টোটা।

যেমন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ড লেন্সকি-এর হিসাব অনুযায়ী, ক্ষতিকর ও উপকারী মিউটেশনের অনুপাত দশ লক্ষ : এক (১,০০০,০০০ : ১)। তিনি আরও যোগ করেছেন, উপকারী মিউটেশনগুলো প্রায়শই দেহের বিদ্যমান কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। তাই সত্যিকারের গঠনমূলক মিউটেশন অবিশ্বাস্যরকম বিরল। বলতে গেলে নেই-ই।[৯] সেই সাথে তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে একটি বিশ্বখ্যাত পরীক্ষা চালাচ্ছেন। সেখানে ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এ পর্যন্ত ৭৫,০০০-এরও বেশী প্রজন্মে বিবর্তিত হ'তে দেওয়া হয়েছে (যা মানুষের ২০ লক্ষ বছরের সমতুল্য)। ফলাফল এই যে, ব্যাকটেরিয়া কিছু পরিবর্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা ব্যাকটেরিয়াই থেকেছে, নতুন কোন ধরনের জীব হয়নি। বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানে ক্ষতিকর মিউটেশন জমছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, ৭৫,০০০ প্রজন্মেও তাতে কোন নতুন জটিল জৈব কার্যক্ষমতা তৈরি হয়নি।[১০]

অন্যদিকে, Nature জার্নালে সম্প্রতি ২০২২ সালে মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় Yeast cell বা ইস্ট কোষে CRISPR পদ্ধতিতে ৮,০০০-এরও বেশী মিউটেশন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ৭৫.৯% 'নিরপেক্ষ' মিউটেশন আসলে মারাত্মক ক্ষতিকর, মাত্র ১.৩% উপকারী।[১১] এছাড়া আধুনিক গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, প্রতিটি নতুন মানব শিশু গড়ে ২ থেকে ১০টি নতুন ক্ষতিকর মিউটেশন নিয়ে জন্মায়। এর গাণিতিক পরিণতি হ'ল, যদি প্রতি প্রজন্মে ২-১০টি ক্ষতিকর মিউটেশন যোগ হয় তাহ'লে জিনোম উন্নত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ অবনতির দিকেই যাচ্ছে।[১২] এজন্য আমেরিকার প্রখ্যাত জিনতত্ত্ববিদ ড. জন সানফোর্ড তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, জিনোম উন্নতির দিকে বিবর্তিত হ'তে পারে না, বরং ক্রমশ অবনতির দিকে যায়। কারণ ক্ষতিকর মিউটেশন এত দ্রুত জমে যে যত বেশী সময় যায়, তত সমস্যা কমে না, বরং বাড়ে। এজন্য মিউটেশনকে তিনি 'জেনেটিক এনট্রপি' (Genetic Entropy) বা জিনোমের বিলুপ্তি প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন।[১৩]

সানফোর্ডের এই সাম্প্রতিক গবেষণা সরাসরি ডারউইনবাদের মূলে আঘাত করে। কেননা ডারউইনবাদ বলছে, মিউটেশন ও নির্বাচনের মাধ্যমে জীব ক্রমশ উন্নত হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছে বিপরীতটাই। অর্থাৎ যদি জিনোম উন্নতির

৬. Ian A. Hatton & others, *The Human Cell Count and Size Distribution* (Proceedings of the National Academy of Sciences 120, no. 39 (2023): e2303077120.
৭. Leslie E Orgel, *The Origin of Life on the Earth* (Scientific American 271 (3), 1994), p. 77–83.
৮. A. Eyre-Walker & P. D. Keightley, *The distribution of fitness effects of new mutations* (Nature Reviews Genetics, (8(8), 2007), p. 610–618.
৯. Richard E. Lenski, *Experimental Evolution and the Dynamics of Adaptation and Genome Evolution in Microorganisms* (Nature Reviews Microbiology 15, 2017), no. 1: 51–64.
১০. Richard E. Lenski & others, *Long-Term Experimental Evolution in Escherichia coli. XIII. Thirteen Thousand Generations of Bacterial Speciation* (Proceedings of the National Academy of Sciences 105, 2008), Supp. 1: 11529–11533.
১১. Xiaoke Shen & others, *Synonymous Mutations in Representative Yeast Genes Are Mostly Strongly Non-Neutral* (Nature 606 (7915) 2022. p. 725–731.
১২. Michael Lynch, *Rate, Molecular Spectrum, and Consequences of Human Mutation* (Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (3), 2010), p. 961–968.
১৩. John C. Sanford, *Genetic Entropy and the Mystery of the Genome* (4th ed. Waterloo, NY: FMS Publications, 2014), p. 33–52.

পরিবর্তে ক্রমশ অবনতির দিকে যায়, তাহ'লে ডারউইনের তথাকথিত 'কোটি বছরে উন্নত প্রাণী তৈরি হওয়া' তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা আর থাকে না।[১৪]

তৃতীয়ত- এলোমেলো মিউটেশন জটিল কোন তথ্য তৈরি করতে পারে না : জীববিজ্ঞানের পাশাপাশি তথ্যবিজ্ঞান (Information Theory)-এর একটি মৌলিক নীতিও এখানে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রযোজ্য। কেননা ডিএনএ কেবল একটি সাধারণ রাসায়নিক অণু নয়, এটি কোটি কোটি অক্ষরে লেখা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট একটি তথ্য-বাহক কোড (Digital Code)। ধরা যাক, কারো হাতে একটি সুন্দর বাংলা উপন্যাস আছে। এখন যদি টাইপ করার সময় বা অন্য কোন কারণে এলোমেলোভাবে (Randomly) কিছু অক্ষর বা শব্দ বদলে দেওয়া হয়, তবে কি উপন্যাসটির মান বা সৌন্দর্য বাড়বে? স্বাভাবিকভাবেই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে বা বাক্যগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে।

একই নিয়ম ডিএনএ-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায় ৩ বিলিয়ন বেস পেয়ারের (Base Pairs) এই জটিল কোডে এলোমেলো পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটলে তা এর কার্যকারিতা উন্নত করার পরিবর্তে সাধারণত নষ্টই করে দেয়। কেননা তথ্যবিজ্ঞানের মূলনীতি হ'ল, যে কোড বা সিস্টেম যত বেশী জটিল, এলোমেলো পরিবর্তন তাকে তত বেশী নষ্ট করে; আরও মূলনীতি হ'ল, যে কোড বা সিস্টেম যত বেশী

বেশী ধ্বংস বা বিকৃত করে। আর ডিএনএ হ'ল পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল তথ্য-কোড। সুতরাং অন্ধ মিউটেশন এই জটিল কোডকে উন্নত করে নতুন কোন অঙ্গ বা গঠন তৈরি করবে, এটি বিশ্বাস করা ঠিক তেমনই অবাস্তব, যেমনভাবে অবিশ্বাস্য যে, বন্যার সময় আকস্মিকভাবে কোন ছাত্রের স্কুলব্যাগে পানি ঢুকে গিয়ে বইয়ের সব ভুল সংশোধন হয়ে যাবে এবং একটি নিখুঁত বিশ্বকোষ তৈরি হয়ে যাবে![১৫]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ডারউইনবাদের যে মৌলিক দাবী, র‍্যান্ডম মিউটেশন জীবনকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে; তার বিপরীতে বিজ্ঞান স্পষ্টতই জানাচ্ছে, র‍্যান্ডম মিউটেশন বরং জীবনকে ধ্বংস করে। অর্থাৎ যাকে দাবী করা হয়েছে 'উন্নতির ইঞ্জিন', বাস্তবে সেটি 'ধ্বংসের ইঞ্জিন'! এই পার্থক্য যেমন মৌলিক, তেমনি এটি ডারউইনবাদের তৃতীয় স্তম্ভকে বৈজ্ঞানিকভাবে অসার প্রমাণ করে দেয়। অতএব র‍্যান্ডম মিউটেশনের মাধ্যমে 'সরলতর নিম্নশ্রেণীর জীব থেকে জটিল এবং উন্নততর নতুন প্রজাতি বা জীবের উদ্ভব হয়' বিবর্তনবাদের এই তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। *(ক্রমশঃ)*

১৪. Sarah Hunter, *Genetic Entropy: A Critical Examination* (Southern Adventist University Knowledge Exchange, 2024).

১৫. Stephen C. Meyer, *Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design* (New York: HarperOne, 2009), p. 195–215, 347–370.

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের প্রতি আমাদের আহ্বান- (১) গণতন্ত্রের নামে সহিংস রাজনীতি পরিহার করতে হবে। (২) হারামাইনের নিরাপত্তা রক্ষায় মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো কূটনৈতিক অবস্থান নিতে হবে। (৩) ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় দূতাবাসগুলোকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। (৪) ভারতে মুসলিম নির্যাতন ও তাদের মসজিদ সমূহ দখলের বিরুদ্ধে সরকারকে সোচ্চার হ'তে হবে। (৫) ওলামায়ে কেরামকে সমাজে তাওহীদী চেতনার বিস্তার এবং সুন্নাতে নববী প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হ'তে হবে এবং শিরক ও বিদ'আতের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুসলিম উম্মাহকে সজাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানবজাতিকে জাহেলিয়াতের থাবা থেকে রক্ষা করুন -আমীন! *(স.স.)*।

মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা : গুরুত্ব, ফযীলত ও সীমারেখা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন কিছু ত্রুটি বা গোনাহ থাকে, যা সে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চায়। ইসলাম মানুষের এসব গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রচার করতে নিষেধ করেছে এবং তওবা ও সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কারও ব্যক্তিগত বিষয় অনুসন্ধান, গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ কিংবা অতীতের ভুলকে জনসমক্ষে ছড়িয়ে দেওয়া যেন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি ও কথোপকথন প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের সম্মানহানি করা হচ্ছে। ইসলাম যেমন অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না, তেমনি অযথা মানুষের গোপনীয়তা ও সম্মান নষ্ট করাকেও সমর্থন করে না। আবার যেখানে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে, যুলুম সংঘটিত হচ্ছে বা মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যথাযথ তথ্য পৌঁছে দেওয়ার বৈধতাও রয়েছে। তাই মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং কখন তা প্রকাশ করা বৈধ আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত :

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*। এই আয়াত মানুষের মর্যাদার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছে। মানুষের সম্মান আল্লাহ প্রদত্ত। তাই কারো সম্মান নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ...كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ، 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না, তার সঙ্গে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। ...প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।[১]

দোষ অনুসন্ধান ও গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ :

কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং তার পিছনে সর্বদা লেগে থাকা ইসলামে নিষিদ্ধ। সেই সাথে গীবত করা থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوا অর্থ হ'ল, মানুষের গোপন অবস্থা ও দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো না।[২]

আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، 'হে মুখে ঈমান গ্রহণকারীগণ! যাদের অন্তরে এখনো ঈমান সুদৃঢ় হয়নি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার গোপন দোষ প্রকাশ করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করেন, তাকে তার নিজ ঘরের ভেতরেও অপদস্থ করে দেন'।[৩]

দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ফযীলত

ইসলাম মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধান, দোষ প্রচার এবং পাপ প্রকাশ করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে এবং এ থেকে বিরত থাকার ও অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছে। তন্মধ্যে কতিপয় ফযীলত নিম্নে উল্লেখিত হ'ল।-

১. দোষ গোপন করা মহান আল্লাহর গুণ :

মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা ইসলামের একটি উত্তম শিক্ষা। কারো দোষ প্রকাশ করে তাকে অপমানিত করা নয়; বরং সংশোধনের সুযোগ দেওয়া এবং তার সম্মান রক্ষা করা মুমিনের উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম লজ্জাশীল ও দোষ গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা

১. *বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।*

২. *তাফসীরে ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

৩. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; তিরমিযী হা/২০৩২, আলবানী, ছহীহ।*

পসন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ গোসল করলে সে যেন আড়াল করে'।[৪] এ হাদীছে আল্লাহ্র একটি বিশেষ গুণ السِّتِّيرُ (দোষ গোপনকারী)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বান্দার দোষ গোপন রাখতে ভালোবাসেন এবং বান্দাদেরও পরস্পরের সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের ব্যক্তিগত ভুল-ত্রুটি প্রচার করা আল্লাহ্র গুণাবলীর পরিপন্থী।

২. মুসলমানদের দোষ গোপনকারীর দোষ স্বয়ং আল্লাহ গোপন রাখবেন :

অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা ইসলামের উত্তম চরিত্রের অন্ত র্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ না করে তা গোপন রাখে এবং তাকে সংশোধনের সুযোগ দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করে তারও দোষ গোপন রাখবেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি দুঃখ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন'।[৫] তিনি আরো বলেন, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে- 'দুনিয়াতে কোন বান্দা অন্য কোন বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখলে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[৭] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন পাপ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[৮] এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দোষ গোপন রাখার বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তবে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে এমন ব্যক্তির কথা বোঝানো হয়েছে, যে প্রকাশ্যে পাপাচারী নয় এবং যার দোষ গোপন রাখলে অন্যের কোন ক্ষতি বা অধিকার নষ্ট হয় না। এমন ব্যক্তির ভুল গোপন রেখে তাকে একান্তে নছীহত করা কর্তব্য।

৩. কারো দোষ গোপন করা তাকে নতুন জীবন দেওয়ার শামিল :

মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কারও কোন দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রকাশ না করে তা গোপন রাখা তার সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করে। এতে সে অপমান ও হেয়প্রতিপন্ন হওয়া থেকে বেঁচে যায় এবং নিজের ভুল সংশোধন করে সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার সুযোগ পায়। তাই কারও দোষ-ত্রুটি গোপন করা কখনো কখনো তাকে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়ার মতো। উক্ববা ইবনু আমির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً، 'যে ব্যক্তি কারো গোপন বিষয় দেখে তা গোপন রাখে, সে যেন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাশিশুকে উদ্ধার করে জীবন দান করল'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ عَوْرَةً، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً، 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন গোপন বিষয় আড়াল করে রাখে, সে যেন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাশিশুকে জীবিত করল'।[১০]

৪. গোপনীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্রে কর্মের অনুরূপ প্রতিদান :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয়তা গোপন রাখে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার গোপনীয়তা গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহ তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তিনি তাকে তার নিজ ঘরেই এর মাধ্যমে অপমানিত করবেন'।[১১]

৫. মৃত ব্যক্তির দোষ গোপন রাখার ফযীলত :

আবু রাফে' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً، 'যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করাবে এবং তার (ত্রুটি বা অপসন্দনীয় বিষয়) গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন'।[১২] সুতরাং মৃত মুসলিমের সম্মান জীবিত অবস্থার মতোই সংরক্ষণ করা যরূরী। গোসলদাতা যদি মৃত ব্যক্তির শরীরে কোন ত্রুটি বা অপ্রীতিকর বিষয় দেখতে পান, তবে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা বৈধ নয়। এতে মৃত ব্যক্তির সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং গোসলদাতা আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমার অধিকারী হন।

নিজের দোষ নিয়ে ব্যস্ত থাকা, অন্যের দোষ না খোঁজা :

অন্যের দোষ অনুসন্ধান করার পূর্বে নিজের ত্রুটি নিয়ে আত্মসমালোচনা করা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি নিজের আত্মশুদ্ধি নিয়ে সদা চিন্তিত থাকে, সে অন্যের দোষ প্রচারে লিপ্ত হওয়ার ফুরসত পায় না। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ

---

৪. আবুদাঊদ হা/৪০১২; নাসাঈ হা/৪০৬, সনদ ছহীহ।
৫. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০।
৬. মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/২০৪ ।
৭. মুসলিম হা/২৫৯০; আহমাদ হা/৯০৩৩ ।
৮. আহমাদ হা/১৭০০১; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৬।
৯. আবুদাঊদ হা/৪৮৯৩; হাকেম হা/৮১৬২, আলবানী ও আরনাঊত্ব যঈফ বললেও ইমাম যাহাবী এর সনদকে ছহীহ বলেছেন।
১০. ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৪৯৯২; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৭।
১১. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮।
১২. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬৯০১; ছহীহুত তারগীব' হা/৩৪৯২।

فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ، ‘তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখের সামান্য খড়কুটো দেখতে পায়, অথচ নিজের চোখের বড় কাঠের গুঁড়িটি ভুলে থাকে’।[১৩] অতএব অন্যের সমালোচনা পরিহার করে নিজেকে সংশোধনের এই নববী শিক্ষার মাঝেই নিহিত আছে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের মূল চাবিকাঠি।

দোষ-ত্রুটি প্রকাশ ও অপমানের ভয়াবহতা

কোন মানুষের দোষ-ত্রুটি জেনে যাওয়ার পর তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা, তাকে অপমান করা কিংবা তার সম্মানহানি ঘটানো অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। কারও দুর্বলতা, ব্যক্তিগত ভুল কিংবা গোপন পাপ নিয়ে মানুষের সামনে আলোচনা করা শরী‘আতের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ‘যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না’ *(নূর ২৪/১৯)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মুমিনের গোপন পাপ ও দোষ প্রচার করাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তা কঠিন শাস্তির কারণ হ’তে পারে।[১৪]

অন্যের সম্মান রক্ষা করা ঈমানের দাবী :

অন্যের সম্মান রক্ষা করা মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। এতে মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ، ‘প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলিমের জন্য হারাম’।[১৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَرْبَا الرِّبَا اسْتِطَالَةُ أَحَدِكُمْ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভয়াবহ সূদ হ’ল কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মানহানি ও তার মান-মর্যাদায় আঘাত করা’।[১৬] তিনি আরো বলেন, ‘নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় সূদ হ’ল সম্মানিত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা’।[১৭] সুতরাং কারও সম্মানহানি করা, তাকে হেয় করা কিংবা তার ব্যক্তিগত দোষ মানুষের সামনে প্রকাশ করা মুমিনের জন্য সমীচীন নয়।

অনুমতি ছাড়া অন্যের গোপন কথা শোনা নিষেধ :

কারও গোপন কথা তার অনুমতি ছাড়া শোনা যেমন নিষেধ, তেমনি তা অন্যের কাছে প্রকাশ করাও নিন্দনীয়। একজন মুমিনের উচিত অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় ও গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ، ‘যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথাবার্তা গোপনে শুনতে থাকে, যা তারা অপসন্দ করে, ক্বিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে’।[১৮]

নিজের গোনাহ ও দোষ-ত্রুটি প্রচারকারীর শাস্তি :

ইসলাম অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি নিজের দোষ-ত্রুটি ও গোনাহকে প্রচার করতেও নিরুৎসাহিত করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার সকল উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত হ’তে পারে; কিন্তু যারা প্রকাশ্যে পাপ করে তারা নয়। প্রকাশ্যে পাপের একটি রূপ হ’ল কোন ব্যক্তি রাতে গোনাহ করল, আল্লাহ তা গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে সে নিজেই বলে বেড়াল, আমি গত রাতে অমুক কাজ করেছি। এভাবে সে আল্লাহ্র দেওয়া পর্দা নিজেই সরিয়ে দেয়’।[১৯] সুতরাং গোপন পাপের ক্ষেত্রে মুমিনের কর্তব্য হ’ল মানুষের কাছে প্রচার না করে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করে তওবা করা।

সত্য কথাও যখন হারাম হয়ে যায় :

অনেকে মনে করেন, আমি তো মিথ্যা বলছি না; যা বলছি, সত্যই বলছি। কিন্তু কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন বিষয় বলা, যা সে শুনলে অপসন্দ করবে, সেটিই গীবত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি জান, গীবত কি’? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, ‘তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপসন্দ করে’। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি যে কথা বলছি, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে?’ তিনি বললেন, ‘তুমি যে কথা বলছ, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে; আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার ওপর অপবাদ আরোপ করলে’।[২০] অতএব কথাটি সত্য হ’লেই তা বলা বৈধ হয়ে যায় না। বরং কারও অনুপস্থিতিতে তার অপসন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা হ’লে তা গীবত হ’তে পারে; আর মিথ্যা হ’লে তা হবে অপবাদ, যা আরও ভয়াবহ।

দোষ-ত্রুটি প্রকাশের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

ইসলামের মূলনীতি হ’ল মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রচার না করা। তবে কিছু ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতি প্রতিরোধ, অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে দোষ প্রকাশ করা বৈধ। এরকম কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার স্বার্থে : মানুষের মধ্যে বিরোধ হ’লে তা বাড়িয়ে না দিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। শান্তি ও

---

১৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৭৬১; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩১।
১৪. তাফসীরে কুরতুবী, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
১৫. মুসলিম হা/ ২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।
১৬. ছহীহাহ হা/৩৯৫০; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৩৭।
১৭. ছহীহাহ হা/১৪৩৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৮৭২।
১৮. তাবারানী কাবীর হা/১১৯৬০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০২৮।
১৯. বুখারী হা/৬০৬৯; মুসলিম হা/২৯৯০।
২০. মুসলিম হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৪৮২৮।

সম্প্রীতি বজায় রাখতে অনেকক্ষেত্রে দোষ ত্রুটি গোপন রাখা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে কল্যাণকর কথা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে। উম্মে কুলছুম বিনতে উক্ববা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِى خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا، 'সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে এবং এজন্য কল্যাণকর কথা পৌঁছে দেয় অথবা উত্তম কথা বলে'।[২১]

ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, তিনটি স্থান ছাড়া আর কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি। যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে, মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ক্ষেত্রে এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর কথা ও স্বামীর সাথে স্ত্রীর কথা বলার ক্ষেত্রে।[২২]

সাধারণভাবে মিথ্যা বলা হারাম। কিন্তু মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে, শত্রুতা সৃষ্টি হ'লে বা ঝগড়া-বিবাদ হ'লে তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভালো কথা বলা বা এক পক্ষের ভালো কথা অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া শরী'আত অনুমোদন করেছে। যেমন দুই মুসলিমের মধ্যে মনোমালিন্য হ'লে। একজন অপরজন সম্পর্কে ভালো কিছু না বলা সত্ত্বেও মীমাংসাকারী ব্যক্তি সম্পর্ক ঠিক করার জন্য বলতে পারে, আপনার ভাই আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নন, তিনি আপনার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখেন এবং সম্পর্ক ঠিক করতে চান। সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কথা বলা যেতে পারে।

২. অধিকার আদায়ে যুলুমের কথা প্রকাশ করা বৈধ : কোন ব্যক্তি যুলুমের শিকার হলে নিজের অধিকার আদায় ও প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তির কাছে যুলুমের কথা প্রকাশ করা বৈধ। তবে উদ্দেশ্য যেন প্রতিশোধ বা অপমান না হয়; বরং ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، 'আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা পসন্দ করেন না। তবে যে অত্যাচারিত হয় (তার কথা স্বতন্ত্র)। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নিসা ৪/১৪৮)*। অতএব কেউ যুলুমের শিকার হ'লে নিজের অধিকার আদায় বা যুলুম প্রতিহত করার জন্য বিচারক, প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যালিমের অপরাধ প্রকাশ করতে পারে।

৩. ফৎওয়া বা শরী'আতের বিধান জানার প্রয়োজনে : কোন ব্যক্তি যুলুম বা অন্যায় সংঘটিত হ'লে এবং তার সমাধানের জন্য আলেমের কাছে ঘটনা প্রকাশ করা বৈধ। আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তিনি আমাকে ও আমার সন্তানকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দেন না। তাই আমি তাকে না জানিয়ে তাঁর সম্পদ থেকে (প্রয়োজন অনুযায়ী) নিয়ে নিই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ، 'তুমি প্রচলিত ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মেটানোর মতো সম্পদ গ্রহণ করো'।[২৩] এখানে হিন্দা (রাঃ) ফৎওয়া জানার জন্য তাঁর স্বামীর দোষ প্রকাশ করেছিলেন।

৪. হাদীছের রাবীর যোগ্যতা যাচাই করা : হাদীছ সংরক্ষণের জন্য মুহাদ্দিছগণ রাবীদের জারহ ও তা'দীল করেছেন। কোন রাবীর দুর্বলতা, মিথ্যাচার বা স্মৃতিশক্তির ত্রুটি থাকলে তা প্রকাশ করা হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، 'সে তার গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং তার গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট সন্তান'! লোকটি বসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন এবং তার প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যখন লোকটিকে দেখলেন, তখন তার সম্পর্কে এ ধরনের কথা বললেন। তারপর তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন এবং তার প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করলেন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কখনও আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হ'ল সে, যার অনিষ্টের ভয়ে মানুষ তার সঙ্গে সম্পর্ক ও মেলামেশা পরিত্যাগ করে'।[২৪] এ থেকে বোঝা যায়, কোন শারঈ প্রয়োজনে ব্যক্তির এমন দোষ উল্লেখ করা বৈধ।

৫. প্রকাশ্য পাপাচারী ব্যক্তির প্রকাশ্য অপরাধ উল্লেখ করা : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ করে এবং তা নিয়ে গর্ব করে, তার প্রকাশ্য অপরাধ উল্লেখ করা দোষণীয় নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সবাই ক্ষমার যোগ্য হ'তে পারে, তবে প্রকাশ্যে পাপাচারকারীরা নয়'।[২৫]

৬. সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সত্য প্রকাশ করা : কোন ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা বা অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য প্রয়োজন হ'লে সত্য গোপন করা যাবে না। বরং সত্য বলে ঘটনার মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، 'আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার হৃদয় পাপিষ্ঠ। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*।

---

২১. বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫ ।
২২. মুসলিম হা/২৬০৫।
২৩. বুখারী হা/৫৩৬৪; মুসলিম হা/১৭১৪ ।
২৪. বুখারী হা/৬০৫৪; মুসলিম হা/২৫৯১।
২৫. বুখারী হা/৬০৬৯; মিশকাত হা/৪৮৩০।

সুতরাং বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সত্য প্রকাশ করা গীবত বা দোষ প্রকাশের পর্যায়ে পড়ে না।

৭. পরামর্শ চাওয়া হ'লে প্রয়োজনীয় দোষ উল্লেখ করা : কেউ যদি বিবাহ, ব্যবসা, অংশীদারিত্ব, চাকরী বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ চায় সেক্ষেত্রে পরামর্শ প্রার্থীকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে জানানো জায়েয। ফাতেমা বিনতে ক্বায়স (রাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، 'আবু জাহম, সেতো তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। আর মু'আবিয়াহ সে এমন দরিদ্র যে তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামাহ ইবনু যায়েদকে বিয়ে করো'।[২৬]

৮. ব্যক্তির অন্যায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে জানানো : কেউ যদি এমন অন্যায় করে যার ফলে মানুষের অধিকার নষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে তা জানানো বৈধ বরং কখনো কখনো তা আবশ্যক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

অতএব কোন অপরাধীকে থামানোর ক্ষমতা যার রয়েছে, তার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া বৈধ। এ বিষয়ে ইমাম নববী (রহঃ) গীবতের বৈধ ক্ষেত্রগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'জেনে রাখো, এমন কোন সঠিক ও শরী'আত সম্মত উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ, যা গীবত ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এর ছয়টি কারণ রয়েছে'।[২৭] যথা- ক. যুলুম প্রতিকারে অভিযোগ পেশ, খ. অন্যায় প্রতিরোধে সক্ষম ব্যক্তিকে অবহিত করা, গ. কোন বিষয়ে ফৎওয়া চাওয়ার জন্য, ঘ. মুসলিমকে ক্ষতি থেকে সতর্ক করা, ঙ. প্রকাশ্য পাপাচার বা বিদ'আতকারীর অপরাধ উল্লেখ করা, চ. কারো পরিচয় দানের প্রয়োজনে দোষ-ত্রুটি বলা।[২৮]

সালাফে ছালেহীন যেভাবে দোষ-ত্রুটি গোপন রাখতেন

কুরআন ও সুন্নাহতে মুসলিমের দোষ গোপন রাখার যে নির্দেশনা এসেছে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও সালাফে ছালেহীন তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী থেকে জানা যায়, তাঁরা অপরাধীকে উৎসাহিত করতেন না; বরং তওবার সুযোগ সৃষ্টি করতেন এবং প্রকাশ্য অপমানের পরিবর্তে সংশোধনকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপস্থাপন করা হ'ল।-

১. মায়েয (রাঃ)-এর ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা :

মায়েয আল-আসলামী (রাঃ) যেনা সংঘটিত হওয়ার পর হাযযাল (রাঃ)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাযযালকে লক্ষ্য করে বলেন, وَيْحَكَ يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رُكْبَةِ هَزَّالٍ، 'হে হাযযাল! তোমার জন্য আফসোস! তুমি যদি তাকে তোমার কাপড় দিয়ে আড়াল করে রাখতে (অর্থাৎ তার অপরাধ গোপন রাখতে), তাহ'লে সেটিই তোমার জন্য উত্তম হ'ত। এরপর তিনি তাঁর হাত দিয়ে হাযযালের হাঁটুর ওপর আঘাত করলেন'।[২৯] ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, হাযযালই মায়েযকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. আবুবকর (রাঃ)-এর গোপন আকাঙ্ক্ষা :

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলতেন, لو أخذتُ سارقًا لأحببتُ أن يستره الله، ولو أخذتُ شاربًا لأحببتُ أن يستره الله، 'আমি যদি কোন চোরকে ধরতাম, তবে চাইতাম আল্লাহ যেন তাকে গোপন রাখেন। আর যদি কোন মদপানকারীকে ধরতাম, তবুও চাইতাম আল্লাহ যেন তার দোষ গোপন রাখেন'।[৩০]

৩. আল্লাহ যা গোপন রেখেছেন, তা প্রকাশে উৎসাহ নয় :

শুরাহবীল ইবনুস-সিমত (রাঃ) একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর লোকদের বললেন, তোমরা এমন একটি এলাকায় অবস্থান করছ, যেখানে অনেক নারী ও পানীয় অর্থাৎ মদ রয়েছে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি এমন কোন অপরাধ করে যার জন্য শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে, তাহ'লে সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তাকে পবিত্র করে দেব। এরপর কিছু লোক তাঁর কাছে এসে হাযির হ'ল। বিষয়টি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে লিখলেন, أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ، 'তোমার জন্য আফসোস! তুমিই কি লোকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, তারা আল্লাহ্র সেই পর্দা উন্মোচন করবে, যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আড়াল করে রেখেছেন'।[৩১]

৪. মুসলিমের দোষ প্রকাশ না হওয়ায় ওছমান (রাঃ)-এর কৃতজ্ঞতা :

একদল লোকের বিরুদ্ধে গোপনে মদপানের সংবাদ পেয়ে ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) সেখানে পৌঁছে দেখলেন তারা

---

২৬. *মুসলিম হা/১৪৮০; মিশকাত হা/৩৩২৪।*
২৭. *রিয়াযুছ ছালেহীন ৪১২ পৃ.।*
২৮. *রিয়াযুছ ছালেহীন পৃ. ৪১২-৪১৩।*
২৯. *আবুদাঊদ হা/৪৩৭৭; মিশকাত হা/৩৫৬৭।*
৩০. *ইবনু আবীদ্দুনিয়া, কিতাবুছ ছামাত; খারায়েত্বী, মাকারেমুল আখলাক্ব হা/৪২২; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৮০৮২।*
৩১. *আব্দুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ হা/৯৩৭১; জামেউল আহাদীছ হা/২৮১৮২।*

চলে গেছে। তখন তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে একটি দাস মুক্ত করে দেন। কারণ তাঁর হাতে কোন মুসলিমের অপমান সংঘটিত হয়নি'।[৩২] এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ছাহাবায়ে কেরাম মানুষের সম্মান রক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। কারো গোপন পাপ প্রকাশ না হওয়াকে তাঁরা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে দেখতেন।

৫. সামান্য লজ্জা থেকেও মুসলিমকে রক্ষার চেষ্টা :

শা'বী (রহঃ) বলেন, একদিন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে বসেছিলেন। উপস্থিত একজনের ওযূ ভেঙে যায়। ওমর (রাঃ) চাইলেন তাকে একাই উঠে ওযূ করতে বলতে। তখন জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! যদি সবাইকে একসঙ্গে ওযূ করার নির্দেশ দিতেন, তাহ'লে ঐ ব্যক্তি লজ্জিত হ'ত না। ওমর (রাঃ) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! জাহেলী যুগেও আপনি কতই না উত্তম নেতা ছিলেন, আর ইসলামের যুগেও আপনি কতই না উত্তম নেতা'।[৩৩] মুসলিমের সম্মান রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এমনকি সামান্য বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকেও মুসলিম ভাইকে রক্ষা করা উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক।

৭. তওবা করলে অতীতের পাপও ক্ষমা হয় :

আমের (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, জাহেলী যুগে আমার একটি কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর আগে আমি তাকে সেখান থেকে বের করে এনেছিলাম। পরে সে ইসলাম কবুল করে। ইসলাম গ্রহণের পর সে আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তখন সে একটি ছুরি নিয়ে নিজেকে যবেহ করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। আমি তাকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, সে তার ঘাড়ের কিছু রগ কেটে ফেলেছিল। আমি তার চিকিৎসা করলাম, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর সে উত্তমভাবে তওবা করল। এখন হে আমীরুল মুমিনীন! তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসছে। আমি কি তার ব্যাপারে যে বিষয়টি ঘটেছিল, তা প্রস্তাবদাতাকে জানাব? ওমর (রাঃ) বললেন, 'তুমি কি তার ব্যাপারে তা প্রকাশ করবে? আল্লাহ যে বিষয়টি গোপন রেখেছেন, তুমি কি তা প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছ? 'আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি মানুষের কাউকে তার ব্যাপারে এ কথা জানাও, তাহ'লে আমি তোমাকে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাত্র বানিয়ে দেব। বরং তাকে একজন পবিত্র-চারিত্রিক মুসলিম নারীর মতোই বিবাহ দাও'।[৩৪]

৮. আল্লাহ প্রথমবার অপরাধেই বান্দাকে অপমানিত করেন না :

ওমর (রাঃ)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হ'ল যে চুরি করেছিল। চোরটি বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। কারণ এটাই আমার প্রথমবার। ওমর (রাঃ) বললেন, كَذَبْتَ، لَيْسَتْ هِيَ الْمَرَّةَ الْأُولَى! 'তুমি মিথ্যা বলেছ। এটাই তোমার প্রথমবার নয়! তখন লোকটি ওমর (রাঃ)-এর ব্যাপারে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইল। সে বলল, আপনি কি গায়েবের জ্ঞান রাখেন? ওমর (রাঃ) বললেন, لَا، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ لَا يَفْضَحُ عَبْدَهُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ، 'না। তবে আমি জানি, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রথমবারের অপরাধেই অপমানিত করেন না। অতঃপর লোকটির হাত কেটে দেওয়া হ'ল। এরপর আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) তার পিছু নিলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, এটা কি তোমার প্রথমবার? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! এটি আমার একুশতম বার'।[৩৫] আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দোষ গোপনকারী। তিনি বারবার তওবার সুযোগ দেন। তাই মানুষের উচিত অন্যের দোষ প্রচার না করে তাকে তওবার সুযোগ দেওয়া।

৯. গুপ্ত বিষয় অনুসন্ধান নিষিদ্ধ ও প্রকাশ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা :

যায়েদ ইবনু ওয়াহব (রহঃ) বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে বলা হ'ল, এই ব্যক্তির দাড়ি থেকে মদের ফোঁটা ঝরছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আমাদেরকে গোপন দোষ অনুসন্ধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তার কাছ থেকে যদি আমাদের সামনে কোন বিষয় প্রকাশ পায়, তাহ'লে আমরা তার ব্যাপারে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব'।[৩৬]

১০. তওবা করলে আল্লাহ বান্দার দোষ গোপন রাখেন :

মূসা (আঃ)-এর যুগে একবার বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অনুরোধ করল, তিনি যেন তাঁর প্রতিপালকের কাছে বৃষ্টির জন্য দো'আ করেন। মূসা (আঃ) পাহাড়ে উঠে তাঁর প্রতিপালকের কাছে দো'আ করলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ তা তাঁকে বললেন, হে মূসা! তোমাদের মধ্যে একজন অবাধ্য ব্যক্তি থাকা অবস্থায় আমি কিভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করব? তখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে বিষয়টি তাদের জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আল্লাহ বৃষ্টি তখনও বর্ষণ করলেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি বেরিয়ে যায়। অথচ কেউই বের হ'ল না। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হ'ল!

মূসা (আঃ) আবার পাহাড়ে উঠে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি লোকদের একত্র করলাম এবং তাদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দিলাম। কিন্তু কেউ বের হ'ল না, অথচ আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করলেন! তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

---

৩২. মুনাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ৬/১৪৯।
৩৩. ইবনু সা'আদ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা হা/৩৯২।
৩৪. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১০৬৯০; ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ৫/১৫৯; মুসানাদুল হারেছ হা/৫০৭।
৩৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আত-তালখীছুল হাবীর হা/১৬১৭-এর আলোচনা ৩/৪৮৩।
৩৬. আবুদাঊদ হা/৪৮৯০; মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৬৫৬৮ সনদ ছহীহ।

তা'আলা বললেন, 'হে মূসা! সেই অবাধ্য ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তওবা করার পরই আমি বৃষ্টি বর্ষণ করেছি'।

মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালককে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! সে কে? যাতে আমরা তাকে চিনতে পারি। আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! সে অবাধ্য থাকা অবস্থায়ও আমি তার গোপনীয়তা রক্ষা করেছি। সুতরাং সে যখন আমার কাছে তওবা করেছে, তখন আমি কিভাবে তার গোপনীয়তা রক্ষা করব না? অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! সে যখন আমার নাফরমানি করছিল, তখনই আমি তার গোপন পাপ প্রকাশ করে দিয়ে তাকে লজ্জিত করিনি; তবে সে যখন আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে, তখন কি আমি তাকে অপমানিত করব? হে মূসা! আমি তো চোগলখোরদের ঘৃণা করি, তাহ'লে আমি নিজে কিভাবে চোগলখোর হব?[৩৭]

৩৭. *ইবনু কুদামাহ, কিতাবুত তাওয়াবীন, পৃ. ৫৫-৫৬; আব্দুর রহমান ছাফূরী, নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফাঈস (মিসর, আল-মাতবা'আতুল কাস্তালিয়্যা, প্রথম প্রকাশ ১২৮৩ হি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩।*

আল্লাহ্‌র অন্যতম গুণ হ'ল দোষ গোপনকারী। তিনি বান্দার দোষ গোপন রাখেন। তাই বান্দারও উচিত মানুষের গোপন গোনাহ খুঁজে বেড়ানো নয়; বরং তওবাকারীকে সম্মানের চোখে দেখা।

উপসংহার :

ইসলাম মানুষের সম্মান ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় অত্যন্ত যত্নশীল। তাই অকারণে অন্যের দোষ অনুসন্ধান ও প্রচার করা শরী'আতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে অধিকার আদায়, যুলুম প্রতিরোধ বা সমাজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার মতো বিশেষ প্রয়োজনে দোষ প্রকাশের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু কাউকে হেয় করা বা বিদ্বেষ ছড়ানো উদ্দেশ্য হ'লে তা গীবত ও অপবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যা হারাম। তাই আসুন! আমরা পরচর্চা ও ছিদ্রান্বেষণের মতো ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখি। অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার এই মহৎ নববী শিক্ষায় আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে আলোকিত করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন আমীন!

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : নভেম্বর ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	২০ জুমাঃ উলাঃ	১৬ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৮	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৭
০৩ নভেম্বর	২২ জুমাঃ উলাঃ	১৮ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৯	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬
০৫ নভেম্বর	২৪ জুমাঃ উলাঃ	২০ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫০	০৬:০৭	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৫
০৭ নভেম্বর	২৬ জুমাঃ উলাঃ	২২ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫১	০৬:০৯	১১:৪৪	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৪
০৯ নভেম্বর	২৮ জুমাঃ উলাঃ	২৪ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫২	০৬:১০	১১:৪৪	০২:৫৩	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	৩০ জুমাঃ উলাঃ	২৬ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫৩	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩৩
১৩ নভেম্বর	০২ জুমাঃ আখেরাহ	২৮ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫৪	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৫ নভেম্বর	০৪ জুমাঃ আখেরাহ	৩০ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫৫	০৬:১৪	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	০৬ জুমাঃ আখেরাহ	০২ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৪:৫৬	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	০৮ জুমাঃ আখেরাহ	০৪ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৪:৫৮	০৬:১৭	১১:৪৫	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
২১ নভেম্বর	১০ জুমাঃ আখেরাহ	০৬ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৪:৫৯	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
২৩ নভেম্বর	১২ জুমাঃ আখেরাহ	০৮ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০০	০৬:১৯	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
২৫ নভেম্বর	১৪ জুমাঃ আখেরাহ	১০ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০০	০৬:২১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	১৬ জুমাঃ আখেরাহ	১২ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০২	০৬:২২	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
২৯ নভেম্বর	১৮ জুমাঃ আখেরাহ	১৪ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৩	০৬:২৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-২	-২	-১
গাযীপুর	০	০	০	-১	০
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-৩	-৩	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+১	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+২	০	-১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	-২	-২	-১
জামালপুর	+৩	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	০	-১	-৩	-৩	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৬	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৫	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+২	+২
পটুয়াখালী	-১	০	+২	+২	+২
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৩	+৩
বরিশাল	-১	০	+১	+২	+১
ভোলা	-২	-১	০	+১	০
বরগুনা	০	+১	+৩	+৩	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৭	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৪	+৩	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৪	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	+১	০	+২
নীলফামারী	+৯	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৪	+১	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৪	+৪	+৫
রংপুর	+৭	+৫	+২	+১	+৩
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	০	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-৩	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৬	-৫	-৬
নোয়াখালী	-৪	-৩	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-১	-১	-১	-১	০
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-১	-১	-১
চট্টগ্রাম	-৭	-৬	-৪	-৩	-৪
কক্সবাজার	-৮	-৬	-৪	-৩	-৪
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৬	-৬	-৬
বান্দরবান	-৯	-৭	-৬	-৫	-৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৮	-৮	-৭
মৌলভীবাযার	-৫	-৫	-৭	-৭	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৫	-৫
সুনামগঞ্জ	-৩	-৪	-৬	-৬	-৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

আমরা কেন ভুলে যাই : বিস্মৃতির মনোবৈজ্ঞানিক কারণ

-ড. মুহাম্মাদ তরুণ হাসান*

কখনো কি এমন হয়েছে যে, বিশেষ কোন কাজে একটি ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু ঢোকার পরই ভুলে গেলেন আপনি কেন এসেছিলেন? কিংবা পরীক্ষার হলে বসে খুব পরিচিত একটি প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই মনে পড়ছে না? দৈনন্দিন জীবনে চাবি হারিয়ে ফেলা বা পরিচিত মানুষের নাম ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনা আমাদের সবার সাথেই ঘটে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'বিস্মৃতি' (Forgetting) বা ভুলে যাওয়া, যা মানুষের স্মৃতি প্রক্রিয়ার (Memory Process) একটি স্বাভাবিক ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য। এই প্রক্রিয়ায় আমরা যেমন প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখি, তেমনি অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু ভুলেও যাই। আমরা যা শিখি এবং পরবর্তীতে মনে করতে পারি, তা হ'ল 'স্মৃতি'। আর যা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ বা পুনরায় মনে করতে ব্যর্থ হই, তা-ই 'বিস্মৃতি'। সহজভাবে বলা যায়, শেখা কোন তথ্যের যে অংশটুকু স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে না বা পরবর্তী সময়ে মনে করা যায় না, সেটিই বিস্মৃতি। বিশেষ করে এই বিষয়টির সাথে বেশী পরিচিত আমাদের শিক্ষার্থীরা। প্রতিনিয়ত তাদেরকে নিত্য নতুন বিভিন্ন বিষয় ও তথ্য শিখতে হয়। ক্লাসের পড়া মুখস্থ করতে হয় ও পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার সময় অনেক জানা বিষয়ও তখন মনে আসে না। ফলে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নোত্তর সুন্দর ও মনের মতো করে উপস্থাপন করতে পারে না। মানুষ আসলে ভুলে যায় কেন? এর পেছনে একক কোন কারণ নেই। মূলত একাধিক মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত কারণে আমরা ভুলে যাই। বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে এই প্রবন্ধে আমরা বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ জানা ও উপলব্ধি করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার মনোবৈজ্ঞানিক কারণসমূহ :

আমরা ভুলে যাই কেন? এই প্রশ্নটি যেমন সকলের মনেই জাগ্রত হয় তেমনি প্রশ্নটি মনোবিজ্ঞানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার পেছনে একক কোন কারণ কাজ করে না। সাধারণত যে উদ্দীপক তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্পষ্ট, অর্থবহ, সুসংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী এবং পুনঃপুনঃ অনুশীলিত হয়, সেগুলো স্মৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে থাকে। অন্যদিকে অস্পষ্ট, অপ্রাসঙ্গিক বা কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজেই বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও বিস্মৃতির পেছনে আরও নানা কারণ রয়েছে, যা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।-

১. মনোযোগের ঘাটতি ও তথ্য প্রক্রিয়াজাত যথাযথ না হওয়া :

আমরা সাধারণত সেই বিষয়গুলোই ভুলে যাই যেগুলো আমরা অতীতে শিখেছি। যে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নেই বা যা আমরা কখনো পড়িনি, তা ভুলে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না! মূল সমস্যাটা হয় শেখার সময়। কোন কিছু পড়ার বা শেখার সময় আমরা যদি পুরোপুরি মনোযোগ না দেই, তবে সেই তথ্য আমাদের স্মৃতিভাণ্ডারে সঠিকভাবে জমা হ'তে পারে না। ফলে পরবর্তীতে তা মনে করতে বেশ কষ্ট হয় বা আমরা সহজেই তা ভুলে যাই। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন সংবেদী স্মৃতি, স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি।

সংবেদী স্মৃতি (Sensory Memory) : এটি চোখের দেখা বা কানে শোনার মতো অনুভূতিগুলোকে এক সেকেণ্ডরও কম সময়ের জন্য ধরে রাখে।

স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি (Short-term Memory) : এই স্তরে কোন তথ্য সাধারণত ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর যদি সেই তথ্য নিয়ে আমরা আর না ভাবি বা অনুশীলন না করি, তবে তা মুছে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long-term Memory) : এই স্তরে পৌঁছানো তথ্য বছরের পর বছর এমনকি সারাজীবন পর্যন্ত আমাদের মনে থাকতে পারে এবং এর ধারণক্ষমতাও অসীম। গবেষণায় দেখা গেছে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এনকোডিং (Encoding) পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কে তথ্য মওজূত করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'এনকোডিং' বা সংকেতায়ন। এনকোডিং হ'ল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা বাইরের যেকোন তথ্যকে একটি বিশেষ সংকেত বা কোডে রূপান্তর করে মস্তিষ্কে জমা রাখে, যাতে পরবর্তীতে আমরা তা সহজেই মনে করতে পারি। এই সংকেত বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। যেমন:

দৃশ্যগত সংকেত : কোন কিছুর ছবি, আকার বা রঙের মাধ্যমে মনে রাখা।

শ্রুতিগত বা ধ্বনিগত সংকেত : কোন শব্দের উচ্চারণ বা শব্দের ঝংকারের মাধ্যমে মনে রাখা।

অর্থগত সংকেত : যখন আমরা কোন কিছুর অর্থ বা মূল ধারণাটি বুঝে তা মনে রাখি।

উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা নতুন একটি শব্দ মুখস্থ করতে যাই, তখন হয়তো আমরা শব্দটির বানান, উচ্চারণ বা এর অর্থের ওপর জোর দেই-এটাই হ'ল সংকেতায়ন। আর এই সংকেতায়ন সঠিকভাবে হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মনোযোগের। শেখার সময় সামান্য অমনোযোগী হ'লেই মস্তিষ্কের এই সংকেত তৈরির প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং আমরা খুব সহজেই শেখা বিষয় ভুলে যাই।

২. স্মৃতির ক্ষয় বা সময়ের সাথে মুছে যাওয়া (Decay) :

স্মৃতির ক্ষয় বলতে বোঝায় কোন কিছু দীর্ঘদিন ব্যবহার না করার ফলে মস্তিষ্ক থেকে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। আমরা যা শিখি বা মুখস্থ করি, তা যদি দীর্ঘদিন চর্চা বা অনুশীলন (Rehearsal) না করি তবে তা একসময় আমাদের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে হারিয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একেই স্মৃতির ক্ষয় বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা যখন নতুন কিছু শিখি, তখন আমাদের মস্তিষ্কে এক ধরনের শারীরবৃত্তীয়

* সহকারী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবর্তন ঘটে বা স্মৃতির দাগ (Memory trace) তৈরি হয়। কিন্তু সেই শেখা বিষয়টি যদি পরবর্তীতে আর কাজে লাগানো না হয় বা চর্চায় না থাকে, তবে সময়ের সাথে সাথে মস্তিষ্কের সেই দাগটি নিজে থেকেই মিলিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে কালক্রমে আমরা আমাদের শেখা বিষয়গুলো আর মনে করতে পারি না এবং তা সম্পূর্ণ ভুলে যাই।

৩. শিক্ষণ প্রতিবন্ধকতা (Interference) :

আমাদের স্মৃতিভাণ্ডারের কোন তথ্য যখন অন্য আরেকটি তথ্য মনে করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, তখন তাকে প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। অর্থাৎ একটি স্মৃতি যখন অন্য স্মৃতিকে মনে করতে বাধা দেয়, তখন আমরা ভুলে যাওয়ার সমস্যায় পড়ি। এই প্রতিবন্ধকতা বা হস্তক্ষেপ মূলত দুই ধরনের হ'তে পারে।

ক. পশ্চাৎমুখী বাধা (Retroactive Interference)। যেমন নতুন শেখা কোন বিষয় যখন আগের শেখা বিষয়কে মনে করতে বাধা দেয়। সহজ কথায়, নতুন স্মৃতির চাপে পুরনো স্মৃতি ভুলে যাওয়া। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ডেভিড স্টার জর্ডানের (David Starr Jordan) কথা ধরা যাক। তিনি যখন তাঁর শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন নাম মুখস্থ করতে শুরু করলেন, তখন তিনি আগের শেখা বিভিন্ন মাছের নাম ভুলে যেতে শুরু করলেন।

খ. সম্মুখমুখী বাধা (Proactive Interference)। যেমন আগের শেখা কোন বিষয় যখন নতুন কোন বিষয় মনে রাখতে বাধা দেয়। অর্থাৎ পুরনো স্মৃতির প্রভাবে নতুন স্মৃতি মস্তিষ্ক ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারে না। ধরুন, আপনি নতুন একটি ফোন নম্বর পেয়েছেন এবং সেটি মুখস্থ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আপনার স্মৃতিতে আগে থেকে জমা থাকা পুরনো ফোন নম্বরটি বারবার মনে পড়তে থাকে। যা নতুন নম্বরটি মনে রাখার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মূলত আগে শেখা বিষয় এবং পরে শেখা বিষয়ের মধ্যে যত বেশী মিল বা সাদৃশ্য থাকে, আমাদের মস্তিষ্কে এই দ্বন্দ্ব বা প্রতিবন্ধকতার পরিমাণও তত বেশী বৃদ্ধি পায়।

৪. প্রেষণা বা আগ্রহের ঘাটতি (Lack of Motivation) :

যেকোন কাজ করার প্রতি আমাদের যে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ বা ভেতরের তাড়না কাজ করে, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় 'প্রেষণা' বা মোটিভেশন (Motivation)। প্রেষণা মূলত মানুষের ভেতরের এমন একটি শক্তি, যা তাকে যেকোন কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেয় বা চালিত করে। কোন কিছু শেখার বা পড়ার সময় যদি আমাদের এই প্রেষণা বা আগ্রহের ঘাটতি থাকে, তবে সেই বিষয়ে আমাদের শেখা বা উপলব্ধি কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। আর কোন বিষয় পুরোপুরিভাবে না শিখলে তা খুব দ্রুত ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থীর যদি গণিতের প্রতি মোটেও আগ্রহ না থাকে, তবে সে যতই চেষ্টা করুক না কেন গণিতের সূত্র বা নিয়মগুলো সে সহজেই ভুলে যাবে। ফলে পরীক্ষার খাতায় সে ভালো লিখতে পারবে না এবং তার ফলাফলও সন্তোষজনক হবে না। অর্থাৎ আগ্রহের অভাবেই স্মৃতি তার ধারণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

৫. অবদমন বা স্মৃতির আত্মগোপন (Repression) :

মানুষ তার অতীতের সব অভিজ্ঞতা সমানভাবে মনে রাখতে পারে না। আমাদের জীবনে এমন অনেক স্মৃতি থাকে, যেগুলো মনে পড়লে আমরা মনে মনে আনন্দ পাই বা আমাদের ইগো আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আবার এমন অনেক অতীত অভিজ্ঞতা থাকে, যা আমাদের মনে তীব্র কষ্ট বা পীড়া দেয়। যেসব স্মৃতি বা ঘটনা মানুষের নিরাপত্তাবোধ বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য হুমকিস্বরূপ, কিংবা যেগুলো আমাদের আত্মসম্মানের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো মনে পড়লে মনের ভেতর এক ধরনের উদ্বেগ, হীনম্মন্যতা ও অস্বস্তি তৈরি হয়। মানসিক এই কষ্ট থেকে বাঁচতে মানুষ নিজের অজান্তেই সেই অপ্রীতিকর ও কষ্টদায়ক স্মৃতিগুলোকে জোর করে তার অবচেতন মনে (Unconscious mind) চাপা দিয়ে রাখে।

দীর্ঘ দিন ধরে অবচেতন মনে এভাবে চাপা পড়ে থাকার ফলে একসময় এই স্মৃতিগুলো আর সহজে আমাদের সচেতন মনে ফিরে আসে না। ফলে আমরা ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। মানসিক প্রশান্তির স্বার্থে বা কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য স্মৃতিকে এভাবে লুকিয়ে ফেলার এই প্রক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানীরা 'ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতি' (Motivated forgetting) বা অবদমন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৬. সংকেত-নির্ভর বিস্মৃতি (Cue-dependent Forgetting) :

অনেক সময় মস্তিষ্কে তথ্য জমা থাকা সত্ত্বেও কেবল উপযুক্ত সংকেতের অভাবেই আমরা তা ভুলে যাই। অর্থাৎ স্মৃতি থেকে কোন কিছু টেনে বের করার জন্য আমাদের একটি নির্দিষ্ট সংকেত (Cue) বা যোগসূত্রের প্রয়োজন হয়, যার অভাবে ঘটে সংকেত-নির্ভর বিস্মৃতি। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি আপনার বাসা বা অফিসের চাবির গোছা কোথায় রেখেছেন তা বেমা'লূম ভুলে গেছেন। সারাদিন আপনি কোথায় কোথায় ঘুরেছেন তা মনে মনে না ভাবা পর্যন্ত চাবির কথা কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু যখনই ভাবতে ভাবতে নির্দিষ্ট কোন জায়গার কথা যেমন লাইব্রেরীর কথা স্মরণ করেন, ঠিক তখনই মনে পড়ে যায় যে চাবিগুলো তো আপনি লাইব্রেরীর ডেস্কের ওপর রেখে এসেছেন! এখানে 'লাইব্রেরী' নামক স্থানটি আপনার স্মৃতি পুনরুদ্ধারের একটি শক্তিশালী সংকেত বা যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। উপযুক্ত এই সংকেতটি না পেলে চাবির অবস্থান হয়তো আপনার আর মনেই পড়ত না।

৭. আবেগী প্রভাব বা অসম্পূর্ণ কাজের চাপ :

ব্যক্তি যখন কোন কাজ সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ হন, তখন তাঁর মধ্যে এক ধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। আর কাজটি সফলভাবে শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সেই চাপের উপশম ঘটে। কিন্তু কাজটি যদি মাঝপথে ব্যাহত বা স্থগিত হয়ে যায়, তবে সেই মানসিক চাপটি দীর্ঘক্ষণ বজায় থাকে। এর ফলে সেই অসমাপ্ত কাজ-সংক্রান্ত স্মৃতিগুলো মনে রাখার প্রবণতা

প্রবল হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানী জেইগারনিক (Zeigarnik) ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের দিয়ে ১৮ থেকে ২২টি কাজের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়েছিলেন। এর মধ্যে অর্ধেক কাজ তারা পুরোপুরি শেষ করেছিলেন এবং বাকী অর্ধেক কাজ পরীক্ষক মাঝপথেই থামিয়ে দিয়েছিলেন। কাজ শেষ হওয়ার বা মাঝপথে থেমে যাওয়ার ঠিক পরপরই অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়েছিল তারা যেন যথাসম্ভব কাজগুলির নাম মনে করার চেষ্টা করে।

ফলাফলে দেখা যায়, যে কাজগুলো মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কথা মনে রাখার হার ছিল অনেক বেশী। এই অসামান্য গবেষণাটি ইতিহাসে 'জেইগারনিক ইফেক্ট' (Zeigarnik Effect) নামে পরিচিত। এই ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা জানতে পারি যে, যেসব কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে যায় মানুষের মস্তিষ্ক তা দ্রুত ভুলে যায়। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ কাজের চেয়ে সম্পূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে বিস্মৃতির পরিমাণ তুলনামূলক বেশী হয়ে থাকে।

৮. শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি বা অসুস্থতা :

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে আমরা অনেক সময় আমাদের জানা বিষয়গুলো ভুলে যাই। মস্তিষ্কে আঘাত, ক্ষত বা টিউমার এবং স্ট্রোকের মতো মারাত্মক কারণে আমাদের স্মৃতিশক্তি অনেকাংশে লোপ পেতে পারে। মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে যে স্মৃতিভ্রম বা 'অ্যামনেশিয়া' (Amnesia) দেখা দেয়, তা মূলত দুই প্রকার। **ক.** পশ্চাৎমুখী স্মৃতিভ্রম (Retrograde Amnesia)। এই অবস্থায় একজন ব্যক্তি মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার আগের ঘটনাগুলো ভুলে যান। **খ.** সম্মুখমুখী স্মৃতিভ্রম (Anterograde Amnesia)। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি আঘাত পাওয়ার পরের কোন নতুন ঘটনার স্মৃতি আর ধরে রাখতে পারেন না।

এছাড়া 'অ্যালঝেইমার' (Alzheimer's Disease) হ'ল এক প্রকার স্নায়ুবিক ব্যাধি, যার কারণে মানুষের স্মৃতিশক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই রোগটি সাধারণত পরিণত বয়সে বা বয়স্কদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

৯. মাদকাসক্তি :

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে তা মস্তিষ্কের কাঠামো ও স্নায়ুবিক প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে স্মৃতি গঠন, সংরক্ষণ ও পুনরায় স্মরণ করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চরমভাবে ব্যাহত হয়। মাদকাসক্তি মূলত মস্তিষ্কের 'হিপোক্যাম্পাস' ও 'প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স' অংশের কার্যক্ষমতা ও কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের স্মৃতিশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একেক ধরনের মাদক মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তিকে একেকভাবে নষ্ট করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী অ্যালকোহল বা মদ পানের ফলে মানুষের মধ্যে 'করসাকফ সিনড্রোম' (Korsakoffs syndrome) দেখা দিতে পারে, যা স্মৃতিভ্রম বা ভুলে যাওয়া রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। নিয়মিত গাঁজা বা ক্যানাবিস সেবনে মস্তিষ্কের স্মৃতিকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মানুষের সাময়িক স্মৃতি (Short-term memory) দুর্বল হয়ে পড়ে। মেথামফেটামিন (Methamphetamine)-এর মতো ক্ষতিকর মাদক দীর্ঘকাল সেবন করলে স্নায়ুতন্ত্রে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হয়, যা মারাত্মক স্মৃতিভ্রম ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে নষ্ট করে।

১০. স্ক্রিন আসক্তি ও গুগল ইফেক্ট :

টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মস্তিষ্কের গঠনকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও, এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও স্নায়ুবিক সংযোগের (Neural connection) ওপর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে পরোক্ষভাবে মানুষের মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাতে অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারের ফলে ডিজিটাল ডিভাইস হ'তে নির্গত নীল আলো (Blue light) মস্তিষ্কের 'মেলাটোনিন' নামক হরমোন ক্ষরণে বাধা দেয়। ফলে ঘুমের গুণগত মান মারাত্মকভাবে কমে যায়। আর পর্যাপ্ত ও গভীর ঘুম ব্যাহত হ'লে তা সরাসরি আমাদের স্মৃতিশক্তির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

এর পাশাপাশি বর্তমানে আরেকটি ভয়ংকর বিষয় দেখা যাচ্ছে, যাকে বলা হয় 'গুগল ইফেক্ট' (Google effect)। মানুষ যখন জানে যে, যেকোন তথ্য পরবর্তীতে ইন্টারনেটে খুঁজলেই সহজে পাওয়া যাবে, তখন তারা সেই তথ্যটি নিজে মনে রাখার চেষ্টা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এর বদলে তথ্যটি ইন্টারনেটের কোথায় পাওয়া যাবে, তারা কেবল সেটাই মনে রাখে। দীর্ঘমেয়াদে ইন্টারনেটের ওপর এই নির্ভরশীলতা মানুষের নিজস্ব স্মরণশক্তি বা স্মৃতি ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রবণতা কমিয়ে দিচ্ছে।

উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ছাড়াও মানুষের তীব্র আবেগ, পরিবেশের ভিন্নতা, অর্থ না বুঝে কোন বিষয় অধ্যয়ন করা ইত্যাদি কারণেও আমরা অনেক সময় তথ্য বিস্মৃত হই বা ভুলে যাই। তাই ভুলে গেলেই নিজেকে অক্ষম ভাবা উচিত নয়; বরং কারণ চিহ্নিত করা যরূরী। তবে বিস্মৃতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে বা দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটালে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র :

১. Weiten, W. (2017). Psychology Themes and Variations (10th Ed.), Cengage Learning, 20 Channel Center Street, Boston, MA 02210, USA

২. Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology (10th Ed.), The Mc Graw-Hill Companies, Inc. 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.

৩. Ali, M. R. (1971). Psychology the Science of Behaviour, Mullick Brothers, Dhaka, p. 300-308.

৪. মোঃ আফছার উদ্দীন (২০০৭), সাধারণ মনোবিজ্ঞান। তাম্রলিপি, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৫. Scott, J. C., Woods, S. P., Matt, G. E., Meyer, R. A., Heaton, R. K., Atkinson, J. H., & Grant, I. (2007). Neurocognitive effects of methamphetamine: a critical review and meta-analysis. *Neuropsychology review*, *17*(3), 275-297.

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা : পরকালীন জীবনের অনন্য পাথেয়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(২য় কিস্তি)

২. দুনিয়াবীর প্রতিযোগিতা বনাম আখেরাতের প্রতিযোগিতা :

বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট সম্পদের অভাব নয়, বরং লক্ষ্যের বিভ্রান্তি। আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্ব আমাদের মস্তিষ্কে অত্যন্ত সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছে এক অদৃশ্য 'ইঁদুর দৌড়' বা র‍্যাট রেস (Rat race)। সমাজে কার ব্যাংক ব্যালান্স কত ভারী হ'ল, কে কত বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ও দামী গাড়ির মালিক হ'ল, কার সন্তান কত নামিদামী স্কুলে পড়ে অন্যের চেয়ে বেশী জাঁকজমকপূর্ণ ফলাফল করল– এই প্রতিযোগিতাই আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একবার কি আমরা থমকে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, এই প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়? মৃত্যুর এক সেকেন্ড পরেই কি এই সকল পার্থিব বৈভব ধুলোয় মিশে যাবে না? পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষের মন ও চিন্তাজগতে এক অসাধারণ পরিবর্তন ঘটায়। ইসলাম আমাদের শেখায় পার্থিব সম্পদ উপার্জন করতে হবে কেবল জীবনযাপনের প্রয়োজন মেটানোর তাকীদে, কিন্তু জীবনের মূল প্রতিযোগিতাটা নির্ধারণ করতে হবে চিরস্থায়ী আখেরাতকে সুন্দর করার জন্য।

আখেরাতের এই প্রতিযোগিতায় মুমিন কতটা সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, তা রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا، 'যদি ক্বিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তবে ক্বিয়ামত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সম্ভব হ'লে যেন চারাটি রোপন করে'।[১] অত্র হাদীছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি ক্বিয়ামতও এসে যায়, আর সেই অবস্থাতে কোন ভালো কাজ করার সুযোগ থাকে, তবে সেটা কালক্ষেপন না করে দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।

একবার ভেবে দেখুন! চোখের সামনে যখন মহাবিশ্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্বিয়ামত নেমে আসছে, সেই সময় একটি চারাগাছ পুঁতে তার ছায়া বা ফল পাওয়ার কি কোন আশা থাকে? জাগতিক যুক্তিতে এটি একেবারেই অর্থহীন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানেই মুমিনের আসল দর্শন উন্মোচন করেছেন। আর সেটা হ'ল মুমিন কখনো জাগতিক ফলাফলের দাস নয়; সে কেবল তার রবের সন্তুষ্টি আর নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টার জন্যই দায়বদ্ধ। তাই পার্থিব হিসাব-নিকাশ ছাপিয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকুও সে বিলিয়ে দেয় কল্যাণের কাজে।

আবূ ওবাদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) যখন ইয়ামেন থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সতর্ক করে বলেছিলেন, وَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করি না; বরং ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল। আর তোমরা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে এটা (পার্থিব প্রাচুর্য) তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[২] আজকের সমাজের দিকে তাকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই সতর্কবাণীর বাস্তবতা আমরা পদে পদে দেখতে পাই। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে মামলা, সামান্য প্রমোশনের জন্য কলিগকে ফাঁসানো; এসবই দুনিয়ার প্রতিযোগিতার করুণ ফলাফল। ইমাম ত্বীবী (রহ.) فَتَنَافَسُوهَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, تَرْغَبُونَ فِيهَا فَتَشْتَغِلُونَ بِجَمْعِهَا أَوْ تَحْرِصُونَ عَلَى إِمْسَاكِهَا فَتَطْغَوْنَ فِيهَا فَتَهْلِكُونَ، 'তোমরা তাতে (পার্থিব সম্পদে) তীব্র আগ্রহী হয়ে পড়বে, ফলে তা একত্রিত ও পুঞ্জীভূত করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে অথবা তা আটকে রাখার তীব্র লোভ পোষণ করবে; যার কারণে তোমরা তাতে সীমালঙ্ঘন করে বসবে, অবশেষে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে'।[৩]

চারপাশের মানুষগুলো যখন হারাম উপার্জনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মত্ত, তখন আমরা নিজেরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমাদের পুরুষেরা যখন শত প্রলোভন মাড়িয়ে ঘুষ ও অসদুপায় এড়িয়ে সততায় অবিচল থাকেন, আর আমাদের নারীরা যখন লোকদেখানো ফ্যাশনের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে পর্দা ও তাক্বওয়ার পথ আঁকড়ে ধরেন; তখন প্রমাণিত হয়, আমাদের হৃদয় ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে নয়, বরং ছুটছে অনন্ত আখেরাতের অমূল্য নে'মতের পানে।

৩. নেক আমলে ধীরস্থিরতা বনাম তাড়াহুড়া :

ছোটবেলা থেকেই আমরা একটি কথা খুব শুনে আসছি– 'তাড়াহুড়ো শয়তানের কাজ,[৪] আর ধীরস্থিরতা হ'ল প্রশংসনীয় গুণ'। দুনিয়াবী জীবনের ক্ষেত্রে কথাটি পুরোপুরি সত্য। কিন্তু ইসলাম আমাদের অগ্রাধিকারের এক অনন্য ভারসাম্য শিখিয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষাভঙ্গির দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এক চমৎকার ইলাহী দর্শন ফুটে

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯; ছহীহুল জামে' হা/১৪২৪, ছহীহ হাদীছ।

২. বুখারী হা/৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩, রাবী আমর ইবনে আওফ (রাঃ)।

৩. ইমাম ত্বীবী, আল-কাশিফু 'আন হাক্বাইক্বিস সুনান, ১০/৩২৭৯।

৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৯৫।

ওঠে। যেখানে পার্থিব জীবিকা ও রিযিক অন্বেষণের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে আল্লাহ ধীরেসুস্থে শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، 'তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তার দিকে দিকে বিচরণ কর এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান' *(মুলক ৬৭/১৫)*। এখানে আল্লাহ 'ফামশূ' (فَامْشُوا) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ– তোমরা ধীরেসুস্থে হাঁটো, পদব্রজে চলো। একজন চাকরীপ্রার্থী তরুণ যখন চাকরীর জন্য চেষ্টা করছে, কিংবা হালাল ব্যবসার চেষ্টা করছেন; তখন ইসলাম বলছে, চেষ্টাটুকু করে যাও, কিন্তু এ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম করো না। কারণ রিযিক মহান আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, তা তোমার কাছে ঠিকই পৌঁছাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল , যখনই ক্ষমা লাভ, তওবা করা কিংবা জান্নাতের আমলের কথা এসেছে, সেখানে শান্তভাবে চলার কোন অবকাশ রাখা হয়নি! সেখানে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন– 'সাবিক্বূ' (প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও), 'সারি'ঊ' (ক্ষিপ্রগতিতে দ্রুত ধাবিত হও), 'ফাসতাবিক্বূ' (অগ্রণী হয়ে ছিনিয়ে নাও)। কারণ রিযিক বান্দাকে খুঁজবে, কিন্তু জান্নাত ও আল্লাহ্র ক্ষমা পেতে হ'লে মুমিন বান্দাকে অলসতা ছুঁড়ে ফেলে ময়দানে দৌড়াতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, التُّؤَدَةُ فِى كُلِّ شَىْءٍ خَيْرٌ إِلاَّ فِى عَمَلِ الآخِرَةِ، 'প্রতিটি বিষয়েই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা উত্তম; কিন্তু আখেরাতের আমল ব্যতীত'।[৫] কেননা পার্থিব বিষয়ে জানা যায় না যে, সেগুলো কি প্রশংসনীয় পরিণতির অধিকারী; যাতে তাতে তাড়াহুড়ো করা যাবে, নাকি নিন্দনীয় পরিণতির অধিকারী; যাতে তা থেকে বিরত থাকা যাবে। পক্ষান্তরে পরকালীন বিষয়াবলী এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যার শুভ পরিণাম সুনিশ্চিত।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالًا، وَإِنَّ لِلْقُلُوبِ فَتْرَةً وَإِدْبَارًا، فَاغْتَنِمُوهَا عِنْدَ شَهْوَتِهَا، وَدَعُوهَا عِنْدَ فَتْرَتِهَا وَإِدْبَارِهَا، 'নিশ্চয়ই অন্তরের আগ্রহ ও উদ্যম রয়েছে, আবার অন্তরের ক্লান্তি ও অনীহাও রয়েছে; সুতরাং যখন তা আগ্রহী ও উদ্যমী থাকে তখন তাকে কাজে লাগাও, আর যখন তা পরিশ্রান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন তাকে ছেড়ে দাও (বিশ্রাম দাও)'।[৭] আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথেও এই কথার অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, আছরের ছালাতের পর হঠাৎ আপনার মনে কুরআন তিলাওয়াতের এক তীব্র আকুলতা জাগল কিংবা পথে কোন অভাবী মানুষকে দেখে পকেটে থাকা কিছু টাকা নির্দ্বিধায় ছাদাক্বা করে দেওয়ার ইচ্ছে হ'ল। অন্তরের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমকে এক মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করা উচিত নয়। এ কারণেই বিজ্ঞ তাবেঈ সুফইয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, إِذَا هَمَمْتَ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِبِرٍّ أَوْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ فَعَجِّلْ مُضِيَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الشَّيْطَانُ 'যখন তুমি কোন ছাদাক্বা, সৎকাজ অথবা কোন নেক আমল করার মনস্থ করবে, তখন তোমার ও তোমার সেই আমলের মাঝে শয়তান কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার আগেই খুব দ্রুত সেটা সম্পাদন করে ফেল'।[৮] কেননা, আপনি যদি ভাবেন- 'এখন তো খুচরো টাকা নেই, থাক কাল দেব' কিংবা 'কুরআনটা আছরে নয়, মাগরিবের পরেই পড়ব'। তবে দেখবেন, শয়তান অবচেতনভাবেই আপনাকে এমন সব তুচ্ছ কাজে জড়িয়ে ফেলবে যে, সেই শুভ সংকল্পটি আর কখনোই বাস্তবে রূপ নেবে না। অন্তরের সেই জীবন্ত অনুভূতিটুকুও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। এজন্যই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) বলেন,كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ يُبَادَرُ بِهِ 'কল্যাণের প্রতিটি কাজেই কালক্ষেপণ না করে দ্রুত এগিয়ে যেতে হয়'।[৯]

অতএব জান্নাতের মেহমান হওয়ার এই অনন্ত প্রতিযোগিতায় আমাদের কারও জন্যই পিছিয়ে থাকার অবকাশ নেই। একজন বান্দা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব কায়েমের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে, একজন সৎ ব্যবসায়ী তার সততা দিয়ে, একজন চাকরিজীবী তাঁর হালাল উপার্জনের আপসহীন লড়াই দিয়ে, একজন তরুণ চরিত্র ও দৃষ্টির পবিত্রতা বজায় রেখে, আর একজন নারী সংসারের সহস্র ব্যস্ততার মাঝেও নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার আবহে এই প্রতিযোগিতায় সবার চেয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। শুধু প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য একটু পরিবর্তন। দুনিয়ার পেছনে অন্ধের মতো ছুটে চলার যে তাড়াহুড়োয় আমরা ক্লান্ত হচ্ছি, আজ থেকে সেই গতিশীলতাটুকু নিবেদিত হোক শুধুই আমাদের রবের ক্ষমার পানে; অনন্ত জান্নাতের চিরসুখের তরে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন! আমীন!

নেকীর কাজে প্রতিযোগিত কেন করব?

পার্থিব জীবনে মানুষ জ্ঞান, সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জনের প্রতিযোগিতায় নিরন্তর ব্যস্ত। পার্থিব সফলতা লাভের জন্য আমরা দীর্ঘ পরিকল্পনা ও কঠোর পরিশ্রম করি। অথচ সৎকাজে ও আখেরাতের প্রতিযোগিতায় আমাদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। দুনিয়ার সুযোগ হাতছাড়া হ'লে আমরা অনুতপ্ত হই; কিন্তু প্রতিদিন আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের অসংখ্য

---

৫. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২১৩২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৫৬; সনদ ছহীহ।
৬. ছান'আনী, আত-তানবীর শারহুল জামি'ইছ ছগীর, ৫/১১১।
৭. খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.), আল-জামি' লি-আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', তাহক্বীক্ব: ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি), ১/৩৩০।
৮. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/৬১।
৯. আবুল হুসাইন ইবনু আবী ইয়া'লা হাম্বলী (৪৫১-৫২৬ হি./১০৫৯-১১৩১ খ্রি.), ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, (রিয়াদ: দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ১/৩৩৯।

সুযোগ হারিয়েও উদাসীন থাকি। ফলে আমাদের ঈমান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে জীবনযাত্রাও দিন দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সেজন্য একজন জান্নাত পিয়াসী মুমিন কখনো দুনিয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় গা ভাসিয়ে দেন না; তিনি সর্বদা আখেরাতের সফলতা অর্জনে উন্মুখ থাকেন। এপর্যায়ে আমরা নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন :

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ'ল, এটি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ। একজন প্রকৃত মুমিনের কাছে আল্লাহ্র নির্দেশের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তিনিই তাওফীক্ব দাতা)। আর তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানকে মানুষের প্রকৃত জীবন লাভের মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করে, তার জীবনই প্রকৃত অর্থে কল্যাণময় হয়ে ওঠে।

পার্থিব জীবনে আমরা দেখতে পাই কোন মুমূর্ষু রোগীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যদি এমন কোন প্রেসক্রিপশন দেন, যা তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাবে। তবে সেই রোগী কোন কালক্ষেপন না করে ঔষধ খাওয়া শুরু করবেন। ঠিক তেমনি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশগুলো আমাদের মৃতপ্রায় আত্মাকে জিন্দা করার প্রেসক্রিপশন। এতে কালক্ষেপণ করা মানে আত্মিক মৃত্যু ডেকে আনা। এজন্যই তাবেঈ রাবী' ইবনে আনাস (মৃ.১৩৯ হি./৭৫৬ খ্রি.) বলেন, السَّابِقُونَ إِلَى إِجَابَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا هُمُ السَّابِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي الْعُقْبَى، 'যারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, তারাই আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে'।[১০] শুধু ডাকে সাড়া দেওয়াই শেষ কথা নয়; বরং ভালো কাজে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'অতএব তোমরা সৎকর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ শুধু নেক আমল করতে বলেননি; বরং নেকীর কাজে অগ্রগামী হওয়ার এবং প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি./১৮৮৯-১৯৫৬ খ্রি.) বলেন, 'কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হওয়ার নির্দেশ কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের নির্দেশের চেয়ে অতিরিক্ত তাৎপর্য বহন করে। কেননা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হওয়ার মধ্যে সেসব কাজ সম্পাদন করা, সেগুলোকে পূর্ণতা দেওয়া, সর্বোত্তম পন্থায় সম্পন্ন করা এবং দ্রুত সেগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হয়, সে-ই আখেরাতে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হবে। অতএব, অগ্রগামীরা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত হ'ল যাবতীয় ফরয ও নফল ইবাদত– যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, ওমরাহ, জিহাদ এবং অন্যের উপকারে আসে এমন এবং কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এমন যাবতীয় কল্যাণকর কাজ'।[১১]

এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, নেকীর প্রতিযোগিতা শুধু আমলের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমলের গুণগত উৎকর্ষতা অর্জনও এর অন্তর্ভুক্ত। একজন ব্যক্তি ছালাত আদায় করলেন, আরেকজন ছালাতের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে খুশূ-খুযূর সঙ্গে তা আদায় করলেন। উভয়ে ছালাত আদায় করলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে ইবাদতকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করার বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে। অনুরূপভাবে একজন ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দান-ছাদাক্বাহ করতে বিলম্ব করেন, অথচ অন্যজন কোন অসহায় মানুষের প্রয়োজনের কথা জানতে পেরে সাথে সাথেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই তৎপরতা ও আন্তরিকতার মধ্যেই নেক আমলে অগ্রগামী হওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পায়।

এই অগ্রগামী হওয়ার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অন্তরে প্রবল স্পৃহা থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، 'যা তোমার উপকারে আসে, তার জন্য আগ্রহী হও; আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অক্ষম হয়ে বসে থেকো না'।[১২] হাদীছটির এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশনায় সফলতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে: (১) কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে, (২) আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং (৩) অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করতে হবে। একজন মুমিন তাই শুধু নেক আমলের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টায় রূপদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

---

১০. *মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবী (৪৩৬-৫১৬ হি.), মা'আলিমুত তানযীল (তাফসীরুল বাগাবী) (রিয়াদ: দারু ত্বায়্যিবাহ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী', ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ৭/৯।*

১১. *আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রাহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, তাহক্বীক্ব: আব্দুর রহমান ইবনু মু'আল্লা আল-লুওয়াইহিক্ব (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭৩।*

১২. *মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯।*

একজন যুবক যখন মসজিদে নিয়মিত ছালাত আদায় করে, তখন তার সঙ্গীরাও অনুপ্রাণিত হ'তে পারে। একজন ব্যবসায়ী যখন সততা ও আমানতদারিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তখন অন্য ব্যবসায়ীরাও সেই আদর্শ অনুসরণে উৎসাহিত হন। একজন মা যখন সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় গড়ে তোলেন, তখন তার কল্যাণকর প্রভাব পরিবার থেকে সমাজে বিস্তৃত হ'তে পারে। এভাবে নেক আমলের প্রতিযোগিতা কেবল ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির মাধ্যম নয়; বরং একটি সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠারও অন্যতম উপায়।

২. সময়ের স্বল্পতা ও জীবনের অনিশ্চয়তা :

আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হ'ল, আমরা সব সময় মনে করি যে, আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় বাকী আছে। আমরা ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করি– পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি করব, আগামী পাঁচ বছর পর ক্যারিয়ার কোথায় যাবে, রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় বাড়ি করব, সঞ্চয় কত হবে– সবকিছুর নিখুঁত হিসাব আমাদের ডায়েরীতে সাজানো থাকে। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে জীবনের ডায়েরীটা যে চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেই হিসাব আমরা রাখি না। অথচ আল্লাহ বলেন, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، 'প্রত্যেক উম্মতের একটা মেয়াদ আছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা তাকে এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবে না, আগাতেও পারবে না' *(ইউনুস ১০/৪৯)*। খ্যাতনামা তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০হি.) বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، كُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ، ذَهَبَ بَعْضُكَ 'হে আদম সন্তান! তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি মাত্র। যখনই তোমার জীবনের একটি দিন চলে যায়, তখনই তোমার একটি অংশ চলে যায়'।[১৩]

সময়ের মূল্য সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের উপলব্ধি ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের মূল্যবান সুযোগ মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তাবেঈ আবূ বকর ইবনু আইয়াশ (৯৫-১৯৩ হি./৭১৩-৮০৯ খ্রি.) বলতেন, لَوْ سَقَطَ مِنْ أَحَدِكُمْ دِرْهَمٌ لَظَلَّ يَوْمَهُ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ، ذَهَبَ دِرْهَمِي، وَهُوَ يَذْهَبُ عُمُرُهُ، وَلَا يَقُولُ: ذَهَبَ عُمُرِي، وَقَدْ كَانَ لِلَّهِ أَقْوَامٌ يُبَادِرُونَ الْأَوْقَاتَ، وَيَحْفَظُونَ السَّاعَاتِ، وَيُلَازِمُونَهَا بِالطَّاعَاتِ، 'তোমাদের কারও একটি দিরহাম হারিয়ে গেলে সে সারাদিন বলতে থাকবে, 'ইন্না লিল্লাহ! আমার দিরহামটি হারিয়ে গেল! অথচ তার জীবন প্রতিনিয়ত ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে বলে না, 'আমার জীবনটি ফুরিয়ে যাচ্ছে! আল্লাহ্র এমন কিছু বান্দা ছিলেন, যাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহারে অগ্রগামী হ'তেন, প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব রাখতেন এবং সেই সময়গুলোতে আনুগত্যমূলক কাজে লিপ্ত থাক'।[১৪] টাকা হারিয়ে গেলে আমরা খুঁজে বেড়াই, কোথায় হারাল, কিভাবে হারাল এবং তা ফিরে পাওয়ার কোন উপায় আছে কি-না। অথচ প্রতিদিন আমাদের জীবন থেকে যে চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার কতটুকু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যয় হয়েছে, সে হিসাব নেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করি না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে আমাদের ক্লান্তি আসে না। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত, দ্বীনী ইলম অর্জন কিংবা আত্মসমালোচনার জন্য সামান্য সময় বের করাও অনেকের কাছে কঠিন মনে হয়।

যেহেতু আমাদের আয়ু খুব সামান্য এবং যেকোন মুহূর্তে এই পার্থিব জীবনের খেলা সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে, তাই একজন বুদ্ধিমান মুমিন শুধু পার্থিব জীবনের জন্যই নেকী কামাই করে না; বরং সে এমন কিছু নেক কাজ করে যায়, মৃত্যুর পর অন্ধকার কবরে শুয়েও যার মুনাফা সে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেতে থাকতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ 'সাতটি কাজের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরও তার কবরে থাকা অবস্থায় তার আমলনামায় পৌঁছতে থাকে: (১) যে ব্যক্তি কাউকে ইলম শিক্ষা দিয়েছে, (২) নদী-খাল প্রবাহিত করেছে, (৩) কূপ খনন করেছে, (৪) খেজুরগাছ রোপণ করেছে, (৫) মসজিদ নির্মাণ করেছে, (৬) কোন মুছহাফ (কুরআনের লিখিত কপি) উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছে, অথবা (৭) এমন সন্তান রেখে গেছে, যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে'।[১৫] মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেলেও তার কল্যাণকর কর্মপ্রচেষ্টার প্রভাব শেষ হয়ে যায় না। একজন শিক্ষক হয়তো বহু বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু তাঁর শেখানো ইলমের মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী দ্বীনের ওপর আমল করছে কিংবা অন্যদের শিক্ষা দিচ্ছে। একজন ব্যক্তি হয়তো একটি মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু সেই মসজিদে এখনো মানুষ ছালাত আদায় করছে। কোন মহিলা ভাবতে পারেন, মসজিদ নির্মাণ বা কূপ খনন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তো আমার নেই। কিন্তু তিনি যদি তার সন্তানকে দ্বীনদার হিসাবে গড়ে তোলেন, যে তার মৃত্যুর পর দু'হাত তুলে তার জন্য কাঁদবে, অথবা মহল্লার কোন শিশুকে কুরআন পড়া শিখিয়ে যান, তবে সেটিই হবে তার জন্য কবরের আঁধারে আলো ছড়ানোর সবচেয়ে বড় ও লাভজনক বিনিয়োগ।

---

১৩. *শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হি.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্: শু'আইব আল-আরনাউত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৫; আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ২/১৪৮।*

১৪. *আবূ আল-ফারাজ আবদুর রহমান ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনিল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.), মাওয়ায়িযু ইবনিল জাওযী (তা.বি), পৃ. ৫৭।*

১৫. *ছহীহুত তারগীব হা/৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০২; সনদ হাসান।*

৩. ফিৎনার যুগে ঈমানের উপর অবিচল থাকা :

বর্তমান যুগ ফিৎনা বা পরীক্ষার যুগ। চতুর্দিক থেকে পাপাচারের এমন সব প্রলয়ংকরী ঢেউ ধেয়ে আসছে, যা প্রতিনিয়ত আমাদের ঈমানের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে যে পবিত্র মন নিয়ে দিন শুরু করি, কর্মব্যস্ত জীবনের নানা ধোঁকা আর প্রলোভনে পড়ে দিন শেষে সেই পবিত্রতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এমন ভয়াবহ অবস্থার ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فتنًا كقطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا 'তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরো সমূহের মত (একটার পর একটা আসতে থাকা) ফিৎনা সমূহের আগেই নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেল। মানুষ সে সময়ে সকালে মুমিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করবে'।[১৬] অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিৎনাকে ঘোর অন্ধকার রাতের টুকরার সাথে তুলনা করেছেন। রাতের ঘোর আঁধারে যেমন মানুষ চলার পথ হারিয়ে ফেলে এবং সামনে কি আছে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না, ফিৎনার বিভ্রান্তিকর সময়েও তেমনি সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা সাধারণ মানুষের চোখে অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে দুর্বল ঈমানের মানুষেরা সহজেই বিভ্রান্তির চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয় এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থ কিংবা ক্ষণিকের মোহে পড়ে নিজের অমূল্য দ্বীন পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়।

যখন ফিৎনার এমন ঘোর অমানিশা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে, তখন একমাত্র বাঁচার উপায় হ'ল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটে যাওয়া। মহান আল্লাহ অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে তাঁর বান্দাদের সেই নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ডাক দিয়ে বলেন, فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، 'অতএব তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হ'তে স্পষ্ট সতর্ককারী' *(যারিয়াত ৫১/৫০)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খ্রি.) (রহঃ) বলেন, فَاهْرُبُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ عِقَابِ اللهِ إِلَى رَحْمَتِهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، 'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা এবং তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাঁর রহমতের দিকে পালিয়ে এসো'।[১৭] ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি./১২৭৩ খ্রি.) বলেন, فِرُّوا مِنْ مَعَاصِيهِ إِلَى طَاعَتِهِ، 'তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে এসো'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فِرُّوا إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ 'তোমরা পাপ থেকে তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও'।[১৮] ফিৎনার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ، 'ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে নেক আমল সম্পাদনে তৎপর হও: (১) ধোঁয়া, (২) দাজ্জাল, (৩) দাব্বাতুল আরয (মাটির গর্ভ হ'তে বের হওয়া জন্তু), (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, (৫) সর্বগ্রাসী ফিৎনা ও (৬) তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপিত ফিৎনা'।[১৯] অত্র হাদীছে সর্বগ্রাসী ফিৎনার অর্থ হ'ল, الْفِتْنَةَ الَّتِي تَعُمُّ النَّاسَ، أَوِ الْأَمْرَ الَّذِي يَسْتَبِدُّ بِهِ الْعَوَامُّ، وَيَكُونُ مِنْ قِبَلِهِمْ دُونَ الْخَوَاصِّ مِنْ تَأْمِيرِ الْأُمَّةِ، 'এমন ফিৎনা যা সকল মানুষকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করবে; অথবা এমন সংকটময় পরিস্থিতি যাতে সাধারণ মূর্খ লোকেরা একক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে এবং উম্মতের নেতৃত্ব বাছাইয়ের বিষয়টি বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে তাদের (সাধারণ অযোগ্যদের) নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়বে'। আর ব্যক্তি বিশেষের ওপর আপতিত ফিৎনা হ'ল- মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যস্ততা, তার সহায়-সম্পত্তি ও চিন্তা-ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী।[২০] আজ আমাদের কর্পোরেট জীবনের দিকে তাকালেই এই হাদীছের বাস্তবতা টের পাওয়া যায়। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, ফ্ল্যাটের কিস্তি মেটানো, ব্যাংক লোন আর ক্যারিয়ার গড়ার প্রতিযোগিতায় এমন এক 'ব্যক্তিগত ফিৎনায়' আটকে গেছি যে, কুরআন তেলাওয়াত করা বা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে পড়ার মতো সময় আমাদের নেই। আমরা যেন এমন এক ঘোরের মধ্যে ছুটছি, যেখান থেকে জাগার আগেই হয়তো মালাকুল মাউত হাযির হয়ে যাবেন! এজন্য খলীফা হারূনুর রশীদ (১৪৯-১৯৩ হি./৭৬৬-৮০৯ খ্রি.) প্রায়ই বলতেন, بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الزَّكِيَّةِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْكَظْمِ، 'তোমরা এই অতিবাহিত হ'তে থাকা (ক্ষণস্থায়ী) দিনগুলোতে পবিত্র ও নেক আমলসমূহ সম্পাদনে অবিলম্বে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রণী হও, মৃত্যুর শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত এসে শ্বাসরোধ করার পূর্বেই'।[২১]

---

১৬. *মুসলিম হা/১১৮; তিরমিযী হা/১৯৫।*
১৭. *আবূ জা'ফর আত-তাবারী, জামে'উল বায়ান ফী তাবীলি কুরআন, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৪০।*
১৮. *মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন (তাফসীরুল কুরতুবী), ১৭/৫৩।*
১৯. *মুসলিম হা/২৯৪৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৫৬; মিশকাত হা/৫৪৬৫।*
২০. *মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী, (মৃ. ১০১৪ হি./১৬০৬ খ্রি.), মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫০।*
২১. *আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দি রাব্বিহী আল-আন্দালুসী (২৪৬-৩২৮ হি.), আল-ইক্বদুল ফরীদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯০।*

৪. আমলের সুযোগ হারানোর ভয় :

নেক আমলে অগ্রগামী হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হ'ল, মানুষ জানে না কখন তার আমল করার সামর্থ্য ও সুযোগ হারিয়ে যাবে। আজ যে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে মসজিদে যেতে পারছেন, আগামীকাল হয়তো অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন। আজ যে ব্যক্তি নিজের উপার্জন থেকে দান-ছাদাক্বাহ করার সামর্থ্য রাখেন, আগামীকাল হয়তো অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হবেন। আজ যে তরুণ দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও শক্তি পাচ্ছেন, ভবিষ্যতে সংসার ও জীবিকার ব্যস্ততায় সেই সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য নেক আমলে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা কেবল একটি প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং জীবনের অনিশ্চয়তার মোকাবেলায় মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (আঃ)-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى 'হে আমার রব! আমি দ্রুত আপনার কাছে চলে এসেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৪)*। মূসা (আঃ)-এর এই বক্তব্যের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। একজন মুমিনের হৃদয়েও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের কোন সুযোগ পেলে সে যেন অনীহা ও গাফিলতি ছেড়ে আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করে।

অনুরূপভাবে নবী যাকারিয়া (আঃ) এবং তাঁর পরিবারের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 'নিশ্চয়ই তারা সৎকর্মে দ্রুত অগ্রসর হ'ত এবং আশা ও ভীতির সঙ্গে আমাদের আহ্বান করত। আর তারা ছিল আমাদের প্রতি বিনীত' *(আম্বিয়া ২১/৯০)*। এখানে নেক আমলের প্রতিযোগিতার সঙ্গে অন্তরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাকে একত্রিত করা হয়েছে: (১) সৎকর্মে দ্রুততা, (২) আল্লাহ্র রহমতের আশা ও তাঁর শাস্তির ভয় এবং (৩) তাঁর সামনে বিনীত হওয়া। অর্থাৎ নেক আমলে অগ্রগামী হওয়ার অর্থ কেবল কর্মব্যস্ততা নয়; বরং এমন এক আত্মিক অবস্থা, যেখানে বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় তৎপর হন, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে পাপ থেকে দূরে থাকেন এবং নিজের আমল নিয়ে অহংকার না করে বিনয়ী হন।

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হ'ল নেক আমলের কোন সুযোগ লাভের সাথে সাথে সেটা লুফে নেওয়া। আমলের দীর্ঘসূত্রিতা থেকে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، 'পাঁচটি অবস্থাকে পাঁচটি অবস্থার পূর্বে মূল্যবান মনে কর: (১) বার্ধক্য আসার আগে তোমার যৌবনকে, (২) অসুস্থতা আসার আগে তোমার সুস্থতাকে, (৩) দারিদ্র্য আসার আগে তোমার সচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরকে এবং (৫) মৃত্যু আসার আগে তোমার জীবনকে'।[২২]

আজ হয়তো সংসারের হাযারো কাজের ভিড়ে কেউ ভাবতে পারেন, 'বয়স হ'লে শান্তিতে বসে বসে কুরআন হিফয করব বা তাহাজ্জুদ পড়ব, বা অমুক অমুক আমল করব'। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা জয়েন্টের তীব্র ব্যথা বাসা বাঁধবে, তখন হয়তো সিজদায় যাওয়ার শারীরিক সক্ষমতাই আর থাকবে না। তাই যৌবনের এই স্বর্ণালী সময় ও সুস্থতাকে অবহেলায় হারিয়ে ফেলা কোনভাবেই কাম্য নয়। প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ فِي مَمَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي آجَالٍ مَنْقُوصَةٍ، وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ، وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً، فَمَنْ زَرَعَ خَيْرًا فَيُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ زَرَعَ شَرًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً، 'নিশ্চয়ই তোমরা দিন ও রাতের পালাবদলের মাঝে এমন এক আয়ুর মধ্যে রয়েছ যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, আর তোমাদের আমলগুলো সংরক্ষিত হচ্ছে এবং মৃত্যু আসবে হঠাৎ করেই। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণের বীজ বপন করবে, সে অচিরেই কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলবে; আর যে ব্যক্তি মন্দের বীজ বপন করবে, সে অচিরেই অনুশোচনার ফসল কাটবে'।[২৩] মূসা ইবনু ত্বালহা (মৃ. ১০৩ হি./৭২১ খ্রি.) বলেন, اجْتَهَدَ الْأَشْعَرِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَمْسَكْتَ أَوْ رَفَقْتَ بِنَفْسِكَ بَعْضَ الرِّفْقِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْلَ إِذَا أُرْسِلَتْ، فَقَارَبَتْ رَأْسَ مَجْرَاهَا، أَخْرَجَتْ جَمِيعَ مَا عِنْدَهَا، وَالَّذِي بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، 'আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তখন তাঁকে বলা হ'ল, আপনি যদি একটু বিরত থাকতেন বা নিজের প্রতি কিছুটা সদয় হ'তেন! তিনি বললেন, দৌড়ের ঘোড়াকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে তার গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন সে তার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেয়। আর আমার জীবনের যা বাকী আছে, তা তো এর চেয়েও অনেক কম'।[২৪] তাই তো ওয়াহিব ইবনুল ওয়ার্দ (মৃ. ১৫৩হি./৭৭০খ্রি.) বলেন, إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَسْبِقَكَ إِلَى اللهِ أَحَدٌ فَافْعَلْ، 'তুমি যদি সক্ষম হও যে, আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ যেন তোমার

---

২২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/ ৩৪৩১৯; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/ ৯৭৬৭; মিশকাত হা/ ৫১৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৫৫, ছহীহ হাদীছ।*

২৩. *আবুল-ফারাজ ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, মুহাক্কিক্: আহমাদ ইবনু আলী (কায়রো, মিসর: দারুল হাদীছ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪; ঐ, যাম্মুল হাওয়া, পৃ. ৬৬৮।*

২৪. *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/৩৯৩।*

আগে এগিয়ে যেতে না পারে, তাহ'লে তা-ই কর'।[২৫] অফিসে কলিগ যদি আমাদের আগে প্রমোশন পেয়ে যায়, আমাদের ভেতরে যেমন জেদ চেপে যায়; তেমনি মসজিদে কেউ আমার আগে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে গেলে বা আমার চেয়ে বেশী দান-ছাদাক্বাহ করলে, মুমিনের হৃদয়েও আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়ার তীব্র ঈর্ষা বা যেদ জন্ম নিতে হবে।

৫. নেকীর কাজে দেরী করা মুনাফিকের স্বভাব :

নেক আমল বা কল্যাণকর কাজ সম্পাদনে গড়িমসি করা, অলসতা প্রদর্শন করা এবং তা আগামীকালের জন্য ফেলে রাখা মোটেও সাধারণ কোন বিষয় নয়। এটি এমন এক ভয়ংকর আত্মিক ব্যাধি, যাকে কুরআন মাজিদে 'মুনাফিকদের স্বভাব' বলা হয়েছে। একজন প্রকৃত মুমিন তার রবের সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলে আনন্দে উদ্বেলিত হবে, এটিই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যার অন্তরে মুনাফিকির বীজ লুকিয়ে আছে, নেক আমল তার কাছে বিশাল বোঝা মনে হয়। মুনাফিকদের এই দৈন্যদশা ও ভয়ংকর মানসিকতা তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا، 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদের বদলা নেন। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, يُصَلُّونَ مُرَاءَاةً وَهُمْ مُتَكَاسِلُونَ مُتَثَاقِلُونَ، لَا يَرْجُونَ ثَوَابًا وَلَا يَعْتَقِدُونَ عَلَى تَرْكِهَا عِقَابًا، 'তারা লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় তারা অলসতা ও অনীহার সঙ্গে ভারাক্রান্ত হয়ে ছালাতে দাঁড়ায়। তারা ছালাত আদায়ের জন্য কোন ছওয়াবের আশা করে না এবং তা পরিত্যাগ করার কারণে কোন শাস্তি হবে বলেও বিশ্বাস করে না'।[২৬]

আজ আমরা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য সকাল আটটায় অফিসে পৌঁছাতে মোটেও অলসতা করি না। তীব্র শীতের সকালে বা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও আমরা বাস বা লোকাল ট্রেনের জন্য স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু সেই তীব্র শীতেই ফজরের আযান শুনে আরামের লেপ ছেড়ে মসজিদে যেতে আমাদের শরীরে যেন পাহাড়সম ক্লান্তি নেমে আসে! দুনিয়ার সামান্য কিছু টাকার জন্য আমরা রাতের ঘুম হারাম করতে পারি, অথচ চিরস্থায়ী জান্নাতের জন্য আমরা নেক আমল করতে অলসতা করি। এটাই কি মুনাফিকের স্বভাব নয়? নিজের ভিতর থেকে এই মুনাফিকী স্বভাব দূর করার জন্যই নেকীর প্রতিযোগিয় অবতীর্ণ হওয়া যরূরী।

[ক্রমশ:]

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

নিরাময় হোমিও হল

পলিপাস (নাকের মাংস বৃদ্ধি) খাবার ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসায় সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ

পলিপাস-এর লক্ষণ

* নাক প্রায় সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
* সারাক্ষণ মাথা ব্যথা করে।
* সব সময় ঠাণ্ডা লেগে থাকে।
* অল্পতেই সর্দি-কাশি লেগে যায়।
* শরীরে এলার্জির পরিমাণ বেড়ে যায়।
* নাক সুঁড় সুঁড় করে,অনেক হাঁচি হতে থাকে।
* ধুলা, ধোঁয়া, কুয়াশা, গন্ধ কোনটাই সহ্য হয় না।
* কান সুঁড় সুঁড় করে, নাক তালু, গলার মধ্যে ভীষণ চুলকায়।

জটিল রোগ সহ যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়ঃ

◆ মাথা ব্যথা ◆ হাঁপানি
◆ টিউমার ◆ প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া
◆ কান পাকা ◆ ব্রণ
◆ বাত ব্যথা ◆ মুখের কালো দাগ
◆ গ্যাস্ট্রিক ◆ হার্নিয়া
◆ ঘন ঘন প্রস্রাব ◆ মেয়েদের বাঁধকের সমস্যা
◆ সাদাস্রাব ◆ মূত্র পাথরী
◆ মাসিকের সময় ব্যথা ◆ পিত্ত পাথরী
◆ জন্ডিস ◆ পাইলস
◆ যৌন সমস্যা ◆ ওভারিয়ান সিস্ট
◆ চর্মরোগ ◆ বাচ্চা না হওয়া

যোগাযোগ

DR AL AMIN AKASH
D.H.M.S, B.H.M.E.C (DHAKA)
Reg-41397
01711106466
01768680036(WhatsApp)

১) চেম্বারঃ সাভার, ঢাকা
২) চেম্বারঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

২৫. *শামসুদ্দীন যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, মুহাক্কিক: ড. বাশশার আওয়াদ মা'রূফ (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খণ্ড ৪, পৃ. ২৫০।*

২৬. *তাফসীরে কুরতুবী, ৫/৪২২।*

যুগে যুগে শী'আদের অপতৎপরতা

-মুজাহিদুল ইসলাম*

(গত সংখ্যার পর)

শী'আদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অপতৎপরতা

ধর্মীয় অপতৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান হরণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর শী'আরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করে। নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে তারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সাম্রাজ্যের তীব্র অভাববোধ করে। ফলে একটি স্থায়ী রাষ্ট্র গঠনে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। আব্বাসীয় যুগে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই তাদের এই রাজনৈতিক অপতৎপরতা প্রকট আকার ধারণ করে। নিম্নে যুগে যুগে তাদের এমন কিছু অপতৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হ'ল।-

(ক) আব্বাসীয় যুগে শী'আদের অপতৎপরতা :

১. উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা :

বিশ্বে তখন মুসলিমদের তৃতীয় খেলাফত ব্যবস্থা আব্বাসীয় খেলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও শী'আরা নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে ওঠে। অমুসলিম অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রচার বা বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করার পরিবর্তে তারা মুসলিম খেলাফতের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোই দখল করতে চায়। তাদের হাতে লাখ লাখ সুন্নী আলেম, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ নির্মমভাবে নিহত হন এবং সাধারণ সুন্নী মুসলমানরা দেশত্যাগে বাধ্য হন। তাদের এই আচরণই কি প্রমাণ করে না যে, তারা মুসলমানদের বন্ধু তো নয়ই; বরং কাফেরদের চেয়েও জঘন্য মুনাফিক শত্রু?

এই ধারাবাহিক দমন-পীড়ন ও ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ শী'আরা (ইছনা আশআরিইয়া সম্প্রদায়) ২৯৭ হিজরীতে (৯০৯ খ্রি.) উত্তর আফ্রিকায় (তিউনিসিয়া) 'উবাইদিয়্যাহ' সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী তাদের প্রথম শাসক ছিল সালামিয়ার হাদ্দাদ বংশীয় ইহুদী বংশোদ্ভূত 'উবাইদ'। উত্তর আফ্রিকায় এসে সে নিজেকে 'উবায়দুল্লাহ' নামে পরিচয় দেয় এবং আলী (রাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধর তথা প্রতীক্ষিত মাহদী হিসাবে মিথ্যা দাবী করে। ৪র্থ শতকের পর অনেক আলেম ও ইমামগণ তার এই ব্যাপারগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। একদল অজ্ঞ মানুষের সমর্থন নিয়ে এই মিথ্যা দাবীদার ঐ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সে 'মাহদিয়া' নামে একটি শহরের গোড়াপত্তন করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাফেযী মতবাদ প্রচার করে নিজের কুফরী আদর্শ ছড়াতে থাকে। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মাদ ও তারপর মানছূর ইসমাঈল শাসনভার গ্রহণ করে। সর্বশেষ খলীফার দায়িত্ব পালন করে তার চাচাতো ভাই 'আযিদ আব্দুল্লাহ'। সে-ই ছিল উবাইদী শী'আ সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলীফা। পর্যায়ক্রমে ১৪ জন শাসক প্রায় ১৮০ বছর এই সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে উমাইয়া খলীফার সংখ্যাও ছিল ১৪ জন। তারা শাসন করেছিলেন মাত্র ৯০ বছর।[১] এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সে যুগে তারা কতটা শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছিল। যার আধুনিক দৃষ্টান্ত হ'ল বর্তমান ইরান।

২. উত্তর আফ্রিকায় তাদের অপকর্মের ফিরিস্তি :

বিশ্বের বুকে আফ্রিকার মাটিতেই শী'আরা সর্বপ্রথম একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়। আব্বাসীয় খেলাফতের রাজনৈতিক দুর্বলতাকে তারা অত্যন্ত সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছিল। শাসনক্ষমতা দখলের পর তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীদের ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাদের সেই অপকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে তুলে ধরা হ'ল।-

ক. উবায়দুল্লাহর নিজেকে রাসূল দাবী এবং সুন্নী আলেম ও সাধারণ মানুষ হত্যা :

পরিস্থিতি এমন এক চরম আকার ধারণ করেছিল যে, রাফেযী উবায়দুল্লাহ নিজেকে রাসূল হিসাবে দাবী করে বসে। মুহাম্মাদ ইবনু খোরাসানের বর্ণনানুসারে, উবায়দুল্লাহ যখন রাক্কাদাহ[২]-তে পৌঁছে, তখন সে কায়রাওয়ান[৩] থেকে ইবনুল বারদূন (রহঃ) ও আবুবকর ইবনু হুযাইল (রহঃ)-কে তলব করে। তারা তার রাজকীয় দরবারে উপস্থিত হয়। সে তার এক অনুচরকে কানে কানে নির্দেশ দেয়। অনুচরটি শায়খদ্বয়কে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল? তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জবাব দেন, والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان: إنه رسول الله، ما قلنا ذلك، 'আল্লাহ্র কসম! যদি সে আমাদের ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, আর তারা উভয়েও যদি বলে যে সে আল্লাহ্র রাসূল, তবুও আমরা এরূপ কথা বলব না'। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে দু'জনকেই হত্যা করার নির্দেশ দেয়।

অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু আবদুল্লাহ আশ-শী'ঈর কাছে কিছু শী'আ অভিযোগ করেছিল যে, এই দুই আলেম উবাইদী রাষ্ট্রের সমালোচনা করে এবং আলী (রাঃ)-কে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করে না। ফলশ্রুতিতে তাদের উভয়কে কারারুদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে কায়রাওয়ানের শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয় ইবনু হুযাইলকে ৫০০ বেত্রাঘাত

* বিএ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, তাহক্বীক্ব: আব্দুল ক্বাদের আরনাঊত্ব, (বৈরূত: দারু ইবনে কাছীর, তৃতীয় সংস্করণ ১৪৩৪ হি:) খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২৮৪।*

২. *বর্তমান তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ান শহরের নিকটবর্তী অঞ্চল।*

৩. *কায়রাওয়ান বর্তমান তিউনিসিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক নগরী। উমাইয়া শাসনামলে ৫০ হিজরী মোতাবেক ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে উকবা ইবনে নাফে' (১-৬৩হি.) এই অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেন।*

করতে এবং ইবনুল বারদূনের গর্দান উড়িয়ে দিতে। কিন্তু শাসক ভুলবশত ইবনু হুযাইলকে হত্যা করে এবং ইবনুল বারদূনকে বেত্রাঘাত করে। পরদিন ইবনুল বারদূনকেও হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, أَترجعُ عَنْ مَذْهَبِكَ؟ 'তুমি কি তোমার মতাদর্শ থেকে ফিরে আসবে?' তিনি কণ্ঠে উত্তর দেন, أَعنِ الإِسْلاَمِ أَرجِع؟ 'আমি কি ইসলাম থেকে ফিরে আসব'?

কেউ কেউ বলেন, উবায়দুল্লাহর নির্দেশে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য ইবনুল বারদূনকে (রহঃ) পা দিয়ে পিষ্ট করে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।[৪]

ইমাম আবুল হাসান আল-কাবিসী (৩২৪-৪০৩হি.) বলেন, 'মাহদিয়া শহরে উবাইদিদের অনুপ্রবেশের পর থেকে তাদের 'দারুল বাহর' নামক কারাগারে প্রায় চার হাযার আলেম, আবেদ ও নেককার মানুষ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আর যারা কারাগারের বাইরে কায়রাওয়ানের রাস্তায় গাছে ঝুলিয়ে হত্যার শিকার হয়েছিলেন, তাদের হিসাব এর বাইরে'। আবু মুহাম্মাদ আল-ওয়ারদানীর মতো অসংখ্য আলেম, যারা ইসলামবিরোধী ফিৎনা দমনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন, নির্মম নির্যাতনের শিকার হওয়ায় তাদের নাম ও অবদান ইতিহাসের পাতায় সেভাবে লেখা হয়নি।[৫] সেই যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের হত্যার এই ধারা অব্যাহত আছে। সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের মতো অঞ্চলগুলো আজও শী'আদের হাতে অসংখ্য সুন্নী আলেমের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।

খ. আহলুস সুন্নাহর দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা ও স্বীয় মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা :

তারা আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আলেমদেরকে মসজিদে দারস-তাদরীস ও ইলমের প্রচার-প্রসার করতে বাধা দিত। ছাত্রদের একত্রে নিয়ে কোন বৈঠকও করতে বাধা দিত। তখন বনু উবাইদের লোকদের ভয়ে লোকেরা ঘরের নিভৃত কোণে বসে কুরআন-সুন্নাহর কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন। বলা হয়ে থাকে আবু মুহাম্মাদ বিন আবু যায়েদ ও আবু মুহাম্মাদ বিন আল-বাত্তানসহ অন্যান্যরা কায়রাওয়ানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুবকর ইবনে লাব্বাদ (রহঃ)-এর কাছে সঙ্গোপনে আসতেন। তারা বনু উবাইদের ভয়ে দুই রানের চিপায় এমনভাবে বইপত্র রাখতেন যে, তাদের রগে টান পড়ে যেত। বনু উবাইদ মানুষকে নিজেদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য করত। যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করত, তারা মুক্তি পেয়ে যেত। কখনো কখনো ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করত। আর যে দাওয়াত পরিহার করত তাকে হত্যা করত। হাযার হাযার আলেম কেবল ইসলামী আদর্শ গ্রহণ এবং সুন্নাহর বিপরীত কর্মতৎপরতা প্রতিরোধ করার কারণে নিহত হন বা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেন।[৬]

তারা আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে সর্বক্ষণ দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখত। তারা মেষ, গাধার মাথা, দোকানপাট ও বাহক জন্তুর মাথায় স্থাপন করত। সেগুলোতে ছাহাবায়ে কেরামের নাম লিখত। এরা ছাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করত। তারা মনে করত নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা বাযারে বাযারে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিজেদের বিশেষ দা'ঈ নিয়োগ করত। কেউ কোন ছাহাবীর ভালো গুণের কথা বললে কিংবা কাউকে আলী (রাঃ)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে তাকে হত্যা করত বা কারাবন্দী করে রাখত।[৭] এমনকি উবায়দীয়ারা বিদ্রোহ ও তাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের আশঙ্কায় জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিল। এজন্য তারা রাতের শুরুর ভাগে একটি শিঙ্গা বাজানোর ব্যবস্থা করেছিল। এরপর যে ব্যক্তিকে বাইরে পাওয়া যেত, তাকে হত্যা করা হ'ত। একইভাবে কোন আলেম মারা গেলে তাঁর জানাযায় যারা সমবেত হ'ত, তাদেরও তারা ছত্রভঙ্গ করে দিত।[৮]

এছাড়াও তারা আহলুস সুন্নাহর আলেমদের রচিত গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করেছিল এবং জনগণকে সেগুলো প্রচার ও আদান-প্রদান থেকে বিরত রেখেছিল। যেমনটি তারা আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাশিম আত-তুজীবী-এর গ্রন্থগুলোর সঙ্গে করেছিল। তিনি ৩৪৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে সাত কান্তার (প্রায় ৩৫০-৪০০ কেজি) পরিমাণ গ্রন্থ ছিল, যেগুলোর সবই তাঁর নিজের হাতের লেখা ছিল। সেগুলো বনু উবায়দের শাসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষবশত সে পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে নেয় এবং জনগণকে সেগুলো থেকে বিরত রাখে।

তারা তৎকালীন ফক্বীহদের উপর ইমাম মালেকের মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়াকে এমন অপরাধ হিসাবে গণ্য করত, যার জন্য বেত্রাঘাত, কারাবাস এমনকি কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হ'ত। এই সঙ্গে এক ধরনের মানসিক সন্ত্রাসবাদও চালানো হ'ত। নিহত ব্যক্তিকে কায়রাওয়ানের বাজারগুলোতে ঘুরিয়ে বেড়ানো হ'ত এবং ঘোষণা করা হ'ত, هذا جزاء من يذهب مذهب مالك 'যে ব্যক্তি ইমাম মালেকের মাযহাব অনুসরণ করে, এটাই তার শাস্তি'। তারা কেবল তাদের নিজস্ব মাযহাব অনুসরণকারী ব্যক্তিকেই ফতওয়া দেওয়ার অনুমতি দিত।[৯] তাদের এই ঘৃণ্য আচরণেই

৪. *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শুআইব আরনাঊত্ব, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪০৫হি.) খণ্ড ১৪, পৃ. ২১৫-২১৭*

৫. *আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ শাওয়াত্ব, মাদরাসাতুল হাদীছ ফিল ক্বায়রোয়ান, (রিয়ায : দারুল আ'লামিয়্যা লিল কিতাবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১১ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৭৪।*

৬. *মুহাম্মাদ ইবনু রিযক আত-তারহূনী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন ফী গারবি আফরীক্বিয়্যাহ, (সঊদী আরব: দারু ইবনুল জাওযী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী' ১ম প্রকাশ১৪২৬ হিজরি) ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।*

৭. *ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী, আদ্-দাওলাতুল উবাইদিয়্যাহ্ ফী লিবিয়া (ওমান: দারুল বায়ারিক্ব, ১ম প্রকাশ ১৪১৮হিজরী) পৃ. ৮৭।*

৮. *আদ্-দাওলাতুল উবাইদিয়্যাহ্ ফী লিবিয়া, পৃ. ৮৮।*

৯. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন ফী গারবি আফরীক্বিয়্যাহ ১/৭৪।*

প্রকাশ পায় যে, তারা নিজেদেরকে দখলদার মনে করত। তাদের শাসন ক্ষমতা নিয়ে সর্বদা তটস্থ থাকতো। তারা তাদের উত্তম আখলাক্ব ও আদর্শ দিয়ে জনগণের মন জয় করতে পারেনি। ঠিক আজকের যুগের গণতন্ত্রপন্থীরা যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে।

গ. আল্লাহ্র বিধানে হস্তক্ষেপ :

সেসময় তারা ফজরের আযান থেকে الصلاة خير من النوم বাদ দিয়ে তদস্থলে حي على خير العمل বাক্য সংযুক্ত করেছিল। মানুষকে রামাযানের ক্বিয়ামুল লাইল ছালাত পড়তে নিষেধ কছেছিল। বলা হয় বনী উবাইদের পক্ষে এই ছালাত আদায় করা বা কাউকে আদায় করতে দেখা দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয় ছিল। তারা চাশতের ছালাত পড়তে নিষেধ করেছিল। মানুষকে ফিৎনায় ফেলার জন্য যোহরের ছালাতের সময় এগিয়ে দিয়েছিল। তারা জুম'আর খুৎবায় ছাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করত। যদিও মানুষ সেটা মেনে নেয়নি। তাদের যুগে মসজিদগুলো বিরান করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের কোন কোন ইমাম রাক্কাদার[১০] দিকে ফিরে ছালাত আদায় করত। উবায়দুল্লাহ যখন মাহদিয়ায় আগমন করে, তখন তারা সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে থাকে। আবার মাঝে মধে তারা মানুষকে শাওয়ালের চাঁদ দেখার আগেই ঈদুল ফিৎর উদযাপন করতে বাধ্য করত। বরং কেউ যদি 'চাঁদ দেখা ছাড়া ঈদুল ফিৎর উদযাপন অবৈধ' ফতওয়া দিত, তবে তাকে হত্যা করা হ'ত। সেসময় তারা বারাকা বিচারপতি ফক্বীহ মুহাম্মাদ বিন হুবলাকে চাঁদ দেখার পূর্বেই ঈদের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে তাকেও নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়।[১১]

ইমাম যাহাবী তাঁর জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, মহামান্য শহীদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হুবলা ছিলেন বারাকা শহরের বিচারপতি। একবার বারাকা শহরের প্রশাসক তার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, আগামীকাল ঈদ। তিনি বললেন,حَتَّى نرَى الهِلَال، وَلَا أُفطِّر النَّاس، وَأَتقلَّد إِثمَهُم 'আমরা ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমি মানুষের ছিয়াম ভেঙ্গে তাদের পাপে বোঝা নিজের কাঁধে নিতে রাজী নই। প্রশাসক বললেন, মানছূরের পত্রে এমন নির্দেশই এসেছে। উবায়দিয়াদের সিদ্ধান্ত হ'ল, তারা দিন গুণে ঈদ করবে। তারা চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করে না। তখন আর চাঁদ দেখা হ'ল না। সকাল বেলা প্রশাসক ঢোল-তবলা ও ঈদের দফ বাজালেন। বিচারপতি ইমাম মুহাম্মাদ বিন হুবলা বললেন, আমি বের হব না, ছালাতও আদায় করব না। তখন প্রশাসক অপর এক লোককে নির্দেশ দিলে সে খুৎবা পড়ে এবং মানছূরের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠি পড়ে শোনায়।

এরপর প্রশাসক বিচারপতিকে ডেকে পাঠান। তাকে বললেন, আপনি আপনার মত পরিবর্তন করুন। আমি আপনার পক্ষ থেকে সুলতানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। বিচারপতি তা থেকে বিরত থাকেন। এর শাস্তিস্বরূপ প্রশাসক তাকে সারাদিন রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখে। এক পর্যায়ে তিনি নিদারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে পানি খেতে চান। কিন্তু তাকে পানি দেওয়া হয়নি। এরপর তারা তাকে শূলে চড়ায়। এমন যালিমদের ওপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ নাযিল হোক।[১২] আবার যে সকল লোক তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেছে তারা তাদের থেকে শরী'আতের ফরয বিধিবিধান পালন শিথিলযোগ্য করে দিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে শারঈ বিধান তাদের থেকে রহিত করে দিয়েছে। যাতে তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হয়। তারা লোকদেরকে প্রভাবিত করে নির্জনকক্ষে নিয়ে যেত। সেখানে উবায়দুল্লাহ দুই হাত পা ছেড়ে চাদর উল্টিয়ে পরিধান করে প্রবেশ করত। তাদের বলা হ'ত, أنكم مثل البهائم لاشيء، لا وضوء ولا صلاة ولا زكاة ولا أي فرض من الفروض، وسقط جميع ذلك عنكم، وأما لباس الفرو مقلوباً فإنما أردت أن أعلمكم أنكم قلبتم الدين، وأما قولي لكم بح، فإنما أردت أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من الزني وشرب الخمر، وجميع ما حرّم الله –تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا 'তোমরা পশুর মতো; তোমাদের ওপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই; না ওযূ, না ছালাত, না যাকাত। আর না ফরযসমূহের কোন কিছু। এর সবই তোমাদের থেকে রহিত হয়ে গেছে। আর উল্টো করে পশমী পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের জানিয়ে দেওয়া যে, তোমরা পূর্বে যে দ্বীনের ওপর ছিলে তা উল্টে দিয়েছো এবং এই (নতুন) দ্বীনে প্রবেশ করেছ। আর তোমাদের জন্য আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের জানিয়ে দেওয়া যে, সমস্ত কিছুই তোমাদের জন্য বৈধ- যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান এবং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তার সবই। যালেমরা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অতি মহান ও বহু উর্ধ্বে'[১৩] নাঊযুবিল্লাহ। এমন ঘোষণা কোন অমুসলিম নেতাও তাদের অনুসারীদের জন্য দিতে পারেনি কখনো।

ঘ. উবাইদিয়্যাহ সাম্রাজ্যকে মিশরে স্থানান্তরসহ বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ড দখল :

মিশর প্রথম দিকে আব্বাসীয় খেলাফতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হ'লেও পরে ২৫৪ হিজরীর ১২ রামাযান (৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) মামলূক বংশোদ্ভূত সাহসী সেনাপতি আহমাদ ইবনে তুলুন গভর্নর হিসাবে মিশরে প্রবেশ করেন।[১৪] আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার সুযোগে তিনি মিসরে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র 'তুলুনি সালতানাত' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার শাসন

১০. *যেখানে তাদের ইমাম উবায়দুল্লাহ থাকতো।*
১১. *আদ্-দাওলাতুল উবাইদিয়্যাহ্ ফী লিবিয়া, পৃ.* ৯১
১২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১৫/৩৭৪
১৩. *আবুবকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মালিকী, রিয়াযুন নুফূস ফী ত্বাবাক্বাতি উলামাই ক্বায়রাওয়ান, (বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ২য় প্রকাশ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.),* ২য় খণ্ড, *পৃ.* ৫০৪-৫০৫।
১৪. *ইবনু আছীর, আল-কামিল ফিত তারিখ,* ৭/২১৫, ১৯৮৭।

দক্ষতায় মিসরকে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তিতে রূপান্তর করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো কায়রোকে তৎকালীন বাগদাদের সমকক্ষ করে তোলে।[১৫] এটি ছিল সুন্নী রাষ্ট্র। পরবর্তীতে মিশরের সর্বশেষ সফল শাসক ছিলেন আল-কাফূর ইখশিদী। যিনি মিশর ও সিরিয়ার অত্যন্ত প্রতাপশালী শাসক ছিলেন।[১৬]

পক্ষান্তরে সে সময়ে আফ্রিকায় উবাদিয়্যাহ সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলীফা হিসাবে ক্ষমতাসীন ছিলেন আল মুঈয। ৩৫৪ হিজরীতে ইহুদীরা আফ্রিকায় প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে আল মুঈয এর সীমানা বিস্তৃত হয়ে মিশরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে। ফলে তার দৃষ্টি পড়ে মিশরের উপর। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত ৩৫৫ হিজরীতে 'আল-কাফূর ইখশিদী' মৃত্যুবরণ করার ফলে মিশরে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন মুঈয এই সুযোগ গ্রহণ করে। সে ৩৫৮ হিজরীতে তার একনিষ্ঠ সেনাপতি জাওহার এর নেতৃত্বে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য মিশরে প্রেরণ করে। সে মিশরকে উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের অন্ত র্ভুক্ত করতে কোন চেষ্টার কমতি রাখে না। ৩৬১ হিজরীতে সে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। (যাতে শিক্ষানীতি পরিবর্তন করে তারা সেখানে রাফেযী মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে)। পরবর্তীতে মিশরে উবাইদিয়্যাহ সাম্রাজ্য উৎখাতকারী সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়্যুবী (রহঃ)-এর ভূমিকায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের ইলম বিতরণের একটি প্রধান দূর্গ হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন চাড়াই উৎরাই পেরিয়ে মিশরভূমি যখন উবাইদিদের অনুকূল হয়, তখন আল-মুঈয ৩৬২ হিজরীতে পরিবার পরিজন নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এ সময় সে জায়নবাদী শাসক বালকীন বিন জারিরের হাতে অফ্রিকার পুরো ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়।[১৭] আফ্রিকায় যে সাম্রাজ্যের নাম ছিল 'উবাইদিয়্যাহ'। মিশরে গিয়ে সেই সাম্রাজ্যের নাম হয় 'ফাতেমিয়্যাহ'। যাকে সংক্ষেপে 'ফাতেমী' বলা হয়। শায়খ তাহের যাভি (রহঃ) বলেন, ফাতেমী সাম্রাজ্য টিকে ছিল ২৬০ বছর। ৫২ বছর মরক্কোয় ও ২০৮ বছর মিশরে। তাদের শাসক বা খলীফা ছিল ১৪ জন। প্রথম খলীফার নাম উবায়দুল্লাহ মাহদী। শেষজনের নাম ছিল আল-আযীদ। সে ৫৬৭ হিজরী সনে ১০ই মুহাররম মিসরে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর মাধ্যমেই পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চল ফাতেমীদের শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।[১৮]

আব্বাসীয় খলীফাদের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে তারা একের পর এক অঞ্চল দখল করতে থাকে। আর সেখানে তাদের মতাদর্শকে মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে থাকে। সর্বপ্রথম আব্বাসীয় খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ ৪০৮ হিজরীতে মু'তাযিলা, রাফেযী, ইসমাঈলীদের অপসারণ ও শাস্তি প্রদানের কর্মসূচী শুরু করেন। পরবর্তীতে সুলতান মাহমূদ গযনবী, গাযী আবুল কাসিম প্রমুখ খলীফাগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের অপসারণের কাজ করেন। ফাতেমী সাম্রাজ্য সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'ফাতেমী খলীফাগণ ধন-সম্পদে প্রাচুর্যবান ছিল। তারা অন্যান্য খলীফাদের চেয়ে বেশী ধনী, অধিক জোর-যুলুমকারীও ছিল। চরিত্রগত দিক থেকে খুবই ধূর্ত ও কদাকার চরিত্রের অধিকারী ছিল। তাদের যুগে রাষ্ট্রসমূহে ব্যাপক অন্যায়-অশ্লীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংখ্য হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলাকারী বৃদ্ধি পেয়েছে। নেককার আলেম-ওলামা ও সৎকর্মশীল আবেদদের সংখ্যা কমে গেছে। সিরিয়ায় নাছিরিয়্যাহ, দারযিয়্যাহ ও হ্যশিশিয়্যাহরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। ফরাসীরা সিরিয়ার উপকূলে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

পর্যায়ক্রমে তারা আল-কুদস, নাবলুস, আজলুন, গূর, গাযা, আসক্বালান, কুর্ক, শোবেক, তাবরিয়া, বানিয়াস, সূর, আক্কা, সাইদা, বৈরূত, নকদ, তারাবলুস, ইন্তাশী'আ ও এর আশেপাশের অঞ্চলসমূহ দখল করে নেয়। তারা অগণিত মুসলমানকে হত্যা করে। যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তারা মুসলিম রমণী, যুবতী ও তাদের সন্তানদেরকে অপহরণ করে। তাদের সঙ্গে এমন পৈশাচিক আচরণ করেছে যা উল্লেখ করার মতো নয়। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম এসকল অঞ্চল জয় করে এগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারা নির্বিবাদে মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। তারা দামেশকের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি করে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। তাদের শক্তি, ক্ষমতা ও সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া, অনুগ্রহ ও স্বীয় ক্ষমতাবলে পুনরায় এসকল অঞ্চলগুলো মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১৯] ফালিল্লাহিল হামদ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ) বায়তুল মাকদিস বিজয়ের পূর্বে এই শী'আদের দমন করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। নুরুদ্দীন জিনকির মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতায় আসার পর সর্বপ্রথম ফাতেমী খেলাফতকে উৎখাত করার প্রয়োজন বোধ করেন। এমনকি নুরুদ্দীন জিনকির অভিপ্রায়ও এটাই ছিল। সুতরাং তারা মুসলিমদের জন্য কতটা বিষফোঁড়া ছিল, সেটা খুব সহজেই অনুমেয়।

৩. মুসলিম সালতানাত 'সেলজুকীদের' সাথে যুদ্ধ :

এই শী'আরা সিরিয়ায় সালজুকি সালতানাতের অবস্থান দুর্বল করার দুরভিসন্ধি করে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদেরকে সহায়তা করে। একপর্যায়ে ৪৪৮ হিজরীতে খোরাসানে সেলজুকদের সাথে শী'আরা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে খোরাসান তাদের হাতছাড়া হয়। শী'আরা তাদের শাসন ব্যবস্থা এতটাই মযবূত

১৫. *জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৩৬৫, ২০০৪।*
১৬. *https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Misk_Kafur*
১৭. *ত্বাহের আহমাদ আয-যাভী, আল-ফাতহুল আরাবী ফী লিবিয়া (দারুল মাদার আল-ইসলামী, চতুর্থ সংস্করণ : ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ) পৃ. ১৮৮*
১৮. *ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী; আদ্-দাওলাতুল উবাইদিয়্যাহ্ ফী লিবিয়া; (ওমান: দারুল বায়ারিক্, ১ম সংস্করণ ১৪১৮হিজরি) পৃ. ৭৩।*
১৯. *ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী; আদ্-দাওলাতুল উবাইদিয়্যাহ্ ওয়াল ফাতিমিয়্যাহ্; (কায়রো: মাকতাবাতুত তাবেঈন) পৃ. ১৩৪।*

করেছিল যে তারা সিরিয়া, হালব এমনকি মক্কা মুকাররমাতেও আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের নেতৃত্বে এই অঞ্চলগুলো আবার মুসলিমদের করতলগত হয় এবং ৪৬২ হিজরীতে মক্কা মুকাররমাও শী'আদের আধিপত্য মুক্ত হয়। তিনি এগুলোকে আবার আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসেন। তখনও সালজুকরা আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনেই ছিল। এছাড়াও শী'আরা ৫০০ হিজরীতে আবার সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে ইছফাহান কেল্লাও তাদের দখলমুক্ত হয়। তারপর ৫২৩ হিজরীতে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে, তারা সিরিয়ার দামেশক খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেবে। বিনিময়ে তাদের 'সূর' শহর (ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত) প্রদান করবে। এই সংবাদ দামেশকের সুন্নী আমীর বূরী ইবনে তাগতাকীন জানতে পেরে ইসমলঈলী শী'আ নেতা মারযুকানীকে হত্যা করেন। সাথে সাথে তাদের আরোও ছয় হাযার লোককে হত্যা করে এই অপতৎপরতার অবসান ঘটান। অন্যদিকে সুলতান সিনজার ৫২১ হিজরীতে শী'আদের আলমাউত কেল্লায় আক্রমণ করে তাদের দুর্বল করে দেন। সেখানে তাদের অনেক লোকও মারা যায়।[২০]

অবশেষে তাদের ফাতেমী সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ৫৬৭ হিজরীতে বায়তুল মাকদিস বিজেতা সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রহঃ)-এর হাত ধরে। ইবনু কাছীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ফাতেমী সাম্রাজ্যের সময়কাল ছিল প্রায় দুইশ বছর। এরপর তারা কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যেমন সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا 'যেন সেখানে তারা কোন কালে ছিলই না'।[২১]

৪. শী'আদের মদদপুষ্ট আব্বাসীয় খেলাফতের পতন :

হিজরী সন তখন ৬৫৬, সাল ১২৫৮। আব্বাসীয় শেষ খলীফা আল-মুস্তা'ছিম। আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদেই তার অবস্থান। দুর্ভাগ্যবশত তার উযির ছিল 'ইবনু আলকামি' নামের এক ধূর্ত রাফেযী শী'আ। সে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের খেলাফতকে হটিয়ে তদস্থলে রাফেযী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ফন্দি আঁটছিল। তার এই চক্রান্ত ছিল তিনটি পর্যায়বিশিষ্ট :

ক. সেনাবাহিনী হ্রাস ও জানগণকে কোনঠাসা করে ফেলা : প্রথমে সে তার মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা বলে মুসলিম সেনাবাহিনীর বেতন হ্রাস করে নেয়। এরপর সেনাবাহিনীতে ছাঁটাই শুরু করে তাদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, উযির ইবনুল আলকামি সেনাবাহিনীকে তাড়ানো এবং রেজিস্টার থেকে তাদের নাম ছাঁটাই করার প্রচেষ্টা চালায়। ফলে দেখা যায় যেখানে খলীফা মুসতানছিরের যুগে খেলাফতের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ, সেখানে তা কমে মাত্র ১০ হাযারে এসে দাঁড়ায়।[২২]

খ. তাতারদের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ : এ সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এরপর সে তাতারদের সঙ্গে পত্রযোগাযোগের মাধ্যমে ফন্দি আঁটে। তাদের বাগদাদ আক্রমণের লোভ দেখায়। তাদের জন্য পথ মসৃণ করে। আর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করে।

গ. তাতারদের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা এবং খলীফা ও জনসাধারণের সাহস ভেঙে ফেলা :

এক্ষেত্রে সে দেশের সাধারণ নাগরিকদের তাতার-বিরোধিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালায়। খলীফা তাঁর উপদেষ্টা এবং তাঁর নিকটজনদের এই ধোঁকায় ফেলে রাখে যে, তাতাররা তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। সবচেয়ে ভালো হবে খলীফা যেন নিজে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি নিয়ে আলোচনা করেন, যাতে নিজেদের মর্যী মোতাবেক সন্ধি করা যায়। সন্ধিতে যেন এটা নির্ধারিত হয় যে, ইরাকের রাজস্বের অর্ধেক খলীফা এবং অর্ধেক তাতাররা ভোগ করবে। সুতরাং দেখা যায় খলীফা তাঁর কাযী, ফক্বীহশ্রেণী, নেতৃবৃন্দ এবং উঁচু পদের যিম্মাদার ও সহযোগীদের সমন্বয়ে ৭০০ লোককে সঙ্গে নিয়ে তাতারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফলাফল দাঁড়ায়, এই চক্রান্তের মাধ্যমে খুব সহজেই খলীফা তাঁর সঙ্গে যাওয়া অন্যান্য নেতাসহ সরকারী কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর জেনারেলদের তাতারদের হাতে হত্যা করিয়ে নেয়।[২৩]

২০. *আদ্-দাওলাতুল উবাইদিয়্যাহ্ ওয়াল ফাতিমিয়্যাহ্, পৃ.* ১১৫-১১৭।
২১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* ১২/২৭৮।
২২. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* ১৩/২০২।
২৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* ১৩/২০১।

হালাল পয়েন্ট বিডি
নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি ১০০% খাঁটি খেজুরের গুড়


সার্বিক যোগাযোগ
প্রোঃ খুরশেদ আলম, বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী
০১৭৫১-৪৭৫৩৬২ ০১৮৬৩-০২৪২৫৯
www.facebook.com/khurshad.rony

আক্রান্ত সঊদী আরব : নিরাপত্তা সংকটে পবিত্র নগরী, মুসলিম বিশ্বের করণীয়

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

মুসলিম উম্মাহ একটি অবিচ্ছেদ্য দেহের মতো, যার এক অংশ ব্যথাতুর হ'লে অপর অংশও ব্যথিত হয়, যার রূহানী ও আত্মিক স্পন্দন হচ্ছে পবিত্র নগরী মক্কা-মদীনা তথা সঊদী আরব। সঊদী আরব হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের হার্ট তথা হৃদপিণ্ড। এটি কেবলমাত্র একটি ভূখণ্ড নয়, নয় একটি ভৌগোলিক সীমান্ত বা মানচিত্রের টুকরো। বরং এটি তাওহীদের আলোকবর্তিকা, অহি-র অবতরণভূমি এবং বিশ্বমুসলিম ঐক্যের চিরন্তন কেন্দ্রবিন্দু। বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ আর মসজিদে নববীর শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ মুসলিম হৃদয়ে যে ঈমানী স্পন্দন সৃষ্টি করে, তা ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করে বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ে। সেকারণ এই পুণ্যভূমিতে সামান্যতম আঘাত, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা কিংবা আক্রমণের কালো ছায়া নেমে এলে তা কেবল কোন একটি রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ থাকে না, বরং তা আঘাত হানে প্রায় ২০০ কোটি মুসলমানের ঈমানী অনুভূতির মূলে। আর এই আক্রমণ যদি হয় কোন স্বজাতির পক্ষ থেকে তখন সেটি কতটা বেদনাবিধুর, কতটা লজ্জাজনক ও কতটা মর্মান্তিক তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

সম্প্রতি ইয়েমেনের উগ্রবাদী সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'হুছী' (حوثي) কর্তৃক সঊদী আরবের বিভিন্ন স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। চলতি অক্টোবর মাসে সে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনায় অন্তত ২৩ জন নিহত এবং ৩৭৪ জন আহত হয়েছেন বলে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ৬ই অক্টোবর জাযান বিমানবন্দরে, ৭ই অক্টোবর আভা ও রিয়াদ বিমানবন্দরে, ৮, ১০ ও ১১ই অক্টোবর রিয়াদ বিমানবন্দরে, ১৩ই অক্টোবর সঊদী আরামকোর যাহরান সদর দফতরে, ২১শে অক্টোবর দাম্মাম বিমানবন্দর ও শায়বাহ তেলক্ষেত্রে এসব হামলা চালানো হয়।

সঊদী নেতৃত্বাধীন জোটের ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, বিমানবন্দরগুলোতে হামলায় ১৯ জন নিহত ও ৩৬৪ জন আহত হয়। পরবর্তীতে ২১শে অক্টোবর দাম্মাম বিমানবন্দর ও শায়বাহ তেলক্ষেত্রের ঘটনায় আরও চারজন নিহত ও ১০ জন আহত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে সর্বমোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ ও আহত হয় ৩৭৪ জন। এসব হামলার মাধ্যমে বিমান চলাচল ও জ্বালানি নিরাপত্তার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিমানবন্দর ও জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে ধারাবাহিক হামলার ঘটনা বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা, বিমান চলাচল এবং জ্বালানি সরবরাহের স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বিশেষ করে আরামকোর মতো গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলার দাবী আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে- কারা এই হুছী? কী তাদের পরিচয়? কেন তারা বিশ্ব মুসলিমের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড সঊদী আরবকে টার্গেট করেছে? এ পর্যায়ে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো-

হুছী কারা?

ইয়েমেনের উত্তরে সঊদী আরবের সীমান্ত (আসীর প্রদেশ) ঘেঁষে একটা পাহাড়ী প্রদেশ 'ছা'দা' (صَعْدَة)। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ শী'আদের একটি গ্রুপ 'যায়দিয়া'দের অনুসারী। যায়দিয়ারা ইরানী শী'আদের একটি শাখা। ইরানী শী'আরা ১২ ইমামে বিশ্বাস করে। কিন্তু যায়দিয়ারা ৫ ইমামে বিশ্বাস করে। হুসাইন (রাঃ)-এর নাতি যায়েদ বিন আলীকে তারা ৫ম ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করে বলে তাদেরকে 'যায়দিয়া' বলা হয়। তাঁর পরে নির্দিষ্ট কোন ইমামে তারা বিশ্বাস করে না, বরং আহ'লে বায়তের বংশধর হওয়ার শর্তে যে কোন জ্ঞানী, ধার্মিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইকারী তাদের দৃষ্টিতে ইমাম হ'তে পারে। তবে রাফেযী শী'আদের বিপরীতে আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্য খলীফাদের খেলাফতকেও স্বীকৃতি দেয়া, গায়েবী ইমাম ও তাকিয়া নীতিতে বিশ্বাসী না হওয়া, মু'তা বিবাহকে নিষিদ্ধ মনে করা, কবরকে গুরুত্বপূর্ণ না মনে করা ইত্যাদি কারণে তাদেরকে আহ'লে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সবচেয়ে নিকটবর্তী মনে করা হয়। তাদের জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি, যা ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ।

দীর্ঘ এক হাযার বছর যাবত এই যায়দিয়ারা উত্তর ইয়েমেন শাসন করে আসছিল। ১৯৬২ সালে মিসরের সমর্থনে একটা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র চালু হয়। নব্বই এর দশকের শেষে যায়দিয়া সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের অংশ হিসাবে যুবকদের মাধ্যমে জন্মলাভ করে এই গ্রুপ। প্রথমে নাম ছিল 'আশ-শাবাব আল-মুমিন'। তাদের আরেকটি নাম হচ্ছে 'আনছারুল্লাহ'। ইরানী বিপ্লব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং ইয়েমেনে সালাফী আক্বীদার প্রসারে ক্ষুব্ধ এই গ্রুপটি শুরুতে সশস্ত্র ছিল না। এর নেতৃত্বে ছিল হুছী পরিবারের সন্তান হুসাইন বদরুদ্দীন আল-হুছী (১৯৫৯-২০০৪)। তার নামানুসারে এই গ্রুপটির নামকরণ হয় 'হুছী'। ২০০৪ সালের জুন মাসে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ ছালেহ-এর নির্দেশে সেদেশের সেনাবাহিনী এই হুছী নেতাকে গ্রেফতার করার জন্য অভিযান চালালে তিনি আত্মসমর্পন না করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিন মাস যুদ্ধ চলার পর তিনি নিহত হন। এরপর তার ভাই আব্দুল মালেক আল-হুছী (জন্ম : ১৯৭৯) তার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনিই হুছীদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। ২০০৪ সালে ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে তাদের বিদ্রোহী তৎপরতা তীব্র হয়। ২০১৪ সালে ইয়েমেনের রাজধানী 'ছান'আ' দখলের পর হুছীরা দেশটির ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রধান শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ২০১৫ সালে সঊদী আরবের নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনে সামরিক অভিযান শুরু করলে হুছীদের সঙ্গে সঊদী আরবের সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সংঘাতের পেছনে ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের পাশাপাশি ইরান ও সঊদী আরবের আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমানে আব্দুল মালিক আল-হুছীর নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠী ইয়েমেনের উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড ও জনবহুল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বর্তমানে তারা ইরানের মদদপুষ্ট হয়ে এবং তাদের অস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তিগত সহায়তায় প্রক্সি যোদ্ধা হিসাবে কাজ করছে। তারা সঊদী আরবের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানোর পাশাপাশি লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলকে লক্ষ্য করেও অভিযান পরিচালনা করেছে। তাদের এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মধ্যপ্রাচ্যের

নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

উল্লেখ্য যে, বিগত এক যুগ থেকে চলে আসা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে সঊদী আরব ও হুছীদের এই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইয়েমেনের সাধারণ জনগণ। ইতিমধ্যে দেড় লাখেরও বেশী মানুষ মারা গেছে সরাসরি যুদ্ধে। হাযার হাযার মানুষ মারা গেছে অনাহারে-দুর্ভিক্ষে। ২০১৬-১৭ সালে সবচেয়ে ভয়াবহ কলেরা হয় এই ইয়েমেনে। এতে আক্রান্ত হয় প্রায় দশ লাখ মানুষ। ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লাখ। তার মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ বেঁচে আছে এখন শুধুমাত্র ত্রাণের উপরে। এক সময়ের সমৃদ্ধ ইয়েমেন এখন কোথায়? যে ইয়েমেন বহু ছাহাবীর পদধূলিধন্য পুণ্যভূমি, যে ইয়েমেনের মুসলমানরা রক্তপাতহীনভাবে শুধুমাত্র কালেমার দাওয়াত পেয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, যে ইয়েমেনে দাওয়াতের জন্য বিখ্যাত ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) দাওয়াতের পদ্ধতি ও নছীহতসহ প্রেরণ করেছিলেন, যে ইয়েমেনে যাকাত নেওয়ার কোন প্রার্থী ছিল না—সে ইয়েমেনের এই হালচিত্র বড়ই নিষ্করুণ।

মক্কা ও মদীনার নিরাপত্তা :

মক্কা ও মদীনা মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা মুসলমানদের ক্বিবলা এবং মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববী ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই কা'বার ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা কারো নেই। মহান আল্লাহ তার ঘর ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিরাপদে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। বিগত যুগে হস্তিবাহিনী কা'বা ধ্বংস করতে এসে যেমন নিজেরা ধ্বংস হয়েছিল, এমনকি চর্বিত ঘাসে পরিণত হয়েছিল *(ফীল ১০৫/৫)*, ঠিক এ যুগেও আবরাহার কোন অনুসারী যদি আল্লাহর পবিত্র ঘর ও পবিত্র নগরী ধ্বংসে অগ্রসর হয় সেও একইভাবে ধ্বংসে নিপতিত হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানরা হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য এই নগরীতে আসেন। ফলে সঊদী আরবের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হ'লে হাজী, ওমরাহযাত্রী ও সাধারণ ভ্রমণকারীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সেকারণ পবিত্র নগরীর নিরাপত্তার জন্য আগাম সতর্কতা, আকাশ প্রতিরক্ষা, যরূরী চিকিৎসা, নিরাপদ পরিবহন এবং হাজীদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা রক্ষা করা সঊদী সরকারের বিশেষ দায়িত্ব হ'লেও এর সঙ্গে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবিক স্বার্থ জড়িত। তাই এই সংকটকে রাজনৈতিক বিরোধের ঊর্ধ্বে দেখতে হবে।

সংঘাতের প্রভাব :

হুছী ও সঊদী আরবের সঙ্গে সংঘাতের বিস্তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রথমত- বেসামরিক মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাহীনতা : বিমানবন্দর, আবাসিক এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো আক্রান্ত হ'লে সাধারণ মানুষ প্রাণহানি, আহত হওয়া এবং বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিতে পড়েন। যুদ্ধের প্রধান ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রায়ই নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও বিদেশী শ্রমিকেরা থাকেন।

দ্বিতীয়ত- হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হওয়া : বিমান চলাচল ব্যাহত হ'লে যাত্রীদের যাত্রাসূচী পরিবর্তন, ফ্লাইট বাতিল, অতিরিক্ত ব্যয় এবং আবাসনসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে। বিশেষত বয়স্ক ও অসুস্থ হাজীদের জন্য এ পরিস্থিতি আরও কঠিন।

তৃতীয়ত- জ্বালানি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা : সঊদী আরব বিশ্ব জ্বালানি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দেশটির তেল স্থাপনা বা সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি হবে।

চতুর্থত- আঞ্চলিক সংঘাতের বিস্তার : হামলার জবাবে পাল্টা সামরিক অভিযান হ'লে সংঘাত আরও দীর্ঘায়িত হ'তে পারে। এতে সঊদী আরব, ইয়েমেন এবং আশপাশের দেশগুলোর জনগণ নতুন মানবিক সংকটের মুখে পড়তে পারেন।

পঞ্চমত- প্রবাসী জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ : সঊদী আরবে কর্মরত লাখ লাখ বিদেশী নাগরিকের নিরাপত্তা ও জীবিকা এ পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের মতো শ্রম অভিবাসননির্ভর দেশের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

মুসলিম বিশ্বের করণীয় :

সঊদী আরবের বিরুদ্ধে হুছীদের সন্ত্রাসী হামলা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা, লোহিত সাগরের নিরাপত্তা এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় মুসলিম বিশ্বকে সমন্বিত, বাস্তবসম্মত এবং দৃঢ় উদ্যোগ নিতে হবে। ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এবং আরব লীগের মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এখনও যদি নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় থাকে, সেটা হবে চরম হতাশার। সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যরূরী বৈঠক, তথ্য বিনিময় এবং যৌথ কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা আশু কর্তব্য। সাম্প্রতিক মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে।

একই সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে- ইরান শুরু থেকেই আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সঊদী আরবের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে এবং এই সংকটকে দীর্ঘায়িত ও জটিল করে তুলেছে। তারা হুছীদের অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি, ড্রোন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে ইয়েমেনে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে এবং সঊদী আরবসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে। লোহিত সাগরে জাহাজ আক্রমণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। ইরানের এই হস্তক্ষেপ বন্ধ না হ'লে মূলত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মুসলিম বিশ্বকে ইরানের এই ধ্বংসাত্মক নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে।

সর্বোপরি সংকটের সমাধানে সব পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ খুঁজতে হবে। তবে সমঝোতা মানে আত্মসমর্পণ নয়। বেসামরিক জনগণের রক্তপাত বন্ধ করা, হাজীদের সুরক্ষা এবং মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র হারামাইনের নিরাপত্তাকেই আলোচনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যুদ্ধ ও সংঘাত কখনো চূড়ান্ত বিচারে শান্তি বয়ে আনে না। সুতরাং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও শান্তির পথ অনুসন্ধানই এখন সময়ের দাবী।

সেই সাথে মনে রাখতে হবে যে, শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে যেমন দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসে না, তেমনি হুছীদের সশস্ত্র তৎপরতাকে উপেক্ষা করেও শান্তি আসবে না। তাই আলোচনার পাশাপাশি ইরানের হস্তক্ষেপ বন্ধে কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

মহান আল্লাহ তাওহীদের দেশ সঊদী আরবকে এবং মুসলিম উম্মাহ্র প্রাণকেন্দ্র হারামাইনকে সকল চক্রান্ত থেকে হেফাযত করুন এবং মুসলিম জনপদগুলোকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

ন্যায়বিচারের অমর কাহিনী

-ড. নূরুল ইসলাম

১. ইয়াতীমের সম্পদ এক পবিত্র আমানত :

আবুল কাসেম ওবায়দুল্লাহ বিন সুলাইমান বলেন, আমি মূসা বিন বুগার (তুর্কী বংশোদ্ভূত আব্বাসীয় খিলাফতের একজন সামরিক নেতা, মৃ. ৮৭৭খ্রি.) সচিবের দায়িত্ব পালন করতাম। আমরা তখন 'রায়' শহরে ছিলাম। সেখানকার বিচারক ছিলেন কুফার আহমাদ বিন বুদাইল (মৃ. ২৫৮ হি.)। মূসা তাঁর একটি জমির বিভিন্ন অংশ একত্র করে সেটিকে আবাদ করতে চাইলেন। সেখানে একজন ইয়াতীমেরও একটি অংশ ছিল।

আমি বিচারক আহমাদ বিন বুদাইলকে ডেকে ইয়াতীমের অংশটি আমাদের কাছে বিক্রি করার অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি রাজি হ'লেন না। তিনি বললেন, ইয়াতীমের তো এখনই জমি বিক্রি করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আশঙ্কা করছি, তার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যদি তার সম্পত্তি বিক্রি করি এবং পরে সেই অর্থের কোন ক্ষতি হয়, তাহ'লে আমি তার সম্পদ নষ্ট করার জন্য দায়ী হব। আমি বললাম, আমরা তার অংশের মূল্যের দ্বিগুণ দেব। তিনি বললেন, এটাও বিক্রির পক্ষে আমার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। সম্পদ বেশী হোক বা কম, ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে একই নীতি প্রযোজ্য। আমি নানা উপায়ে তাঁকে সম্মত করানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। এতে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, হে বিচারক! আপনি কি জানেন না, তিনি মূসা বিন বুগা? বিচারক উত্তর দিলেন, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন! এখানে বিবেচ্য ব্যক্তি মূসা বিন বুগা নন; বরং আল্লাহ তা'আলা!

একথা শুনে আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম। এরপর আর তাঁকে অনুরোধ করিনি। আমি মূসার কাছে ফিরে গিয়ে জমির বিষয়ে সব ঘটনা খুলে বললাম। তিনি যখন শুনলেন যে, বিচারক বলেছেন, এখানে বিবেচ্য ব্যক্তি মূসা নন, বরং আল্লাহ, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। এরপর তিনি বললেন, এই জমির বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ নিয়ো না। আর ঐ নেককার বিচারকের প্রয়োজনের খোঁজ নাও। তাঁর কোন প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করো।

আমি বিচারককে ডেকে জানালাম, আমীর জমির বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতে চান। বিচারক তাঁর জন্য দো'আ করে বললেন, এ ধরনের আচরণই তাঁর নে'মতকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য অধিক উপযোগী। আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আমার বেতন নিয়মিত দেওয়া হোক। কয়েক মাস ধরে বেতন বন্ধ রয়েছে, এতে আমি ভীষণ কষ্টে পড়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাঁর বেতন নিয়মিত করে দিলাম।[১]

শিক্ষা : ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষা করা এক পবিত্র আমানত। ক্ষমতাবান ব্যক্তির আর্থিক স্বার্থের চেয়েও ইয়াতীমের সম্পদের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাবে। বিচারক আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে মানুষের ভয় ও চাপের ঊর্ধ্বে স্থান দিবেন।

২. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর ন্যায়বিচার ও অসহায় ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা : একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (৬১-১০১ হি.) হিমছের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দুইখণ্ড মোটা খসখসে কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি নির্যাতিত হ'লে সে যেন আপনার কাছে আসে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তাহ'লে দূরদেশ থেকে আসা একজন নির্যাতিত ব্যক্তি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছে। ওমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ী কোথায়? লোকটি বলল, ইয়েমেনের এডেনের (আদান) নিকটবর্তী আবইয়ান অঞ্চলে। তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমার বাড়ী ওমরের বাড়ী থেকে অনেক দূরে। একথা বলে তিনি সেখানেই তাঁর বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতি কি অন্যায় করা হয়েছে?

লোকটি বলল, আমার একখণ্ড জমি ছিল। একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি জোরপূর্বক আমার কাছ থেকে সেটি ছিনিয়ে নিয়েছে। ওমর বিন আব্দুল আযীয উরওয়া বিন মুহাম্মাদকে (মৃ. ১২০হি.) চিঠি লিখে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন লোকটির সাক্ষ্য-প্রমাণ শুনে বিচার করেন। তার অধিকার প্রমাণিত হ'লে জমিটি তাকে ফিরিয়ে দেন। চিঠি লেখা শেষ হ'লে লোকটি চলে যেতে উদ্যত হ'ল। তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয তাকে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তুমি তো অনেক দূর থেকে আমাদের কাছে এসেছ। তোমার কতটুকু খাবার-সামগ্রী খরচ হয়েছে, আসতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং তোমার পোষাক কতখানি পুরোনো হয়েছে-সেগুলোর হিসাব করো। লোকটি হিসাব করে দেখল, তার মোট এগারো দীনার খরচ হয়েছে। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) তাকে সেই অর্থ দিয়ে দিলেন।[২]

শিক্ষা : ন্যায়বিচার শুধু অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ন্যায়বিচার পেতে গিয়ে একজন নির্যাতিত ব্যক্তির যে যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় হয়, সেগুলোর প্রতিও দায়িত্বশীল শাসকের দৃষ্টি রাখা উচিত।

৩. পরস্পরের হক আদায়ে সচেতনতা মামলার সংখ্যা হ্রাস করে :

ছালেহ বিন মুসলিম তাবেঈ আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন সালামাহ (১-৮২ হি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সালমান বিন রাবী'আকে মাদায়েন শহরে বিচারকের আসনে বসে থাকতে দেখেছি। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁকে চল্লিশ দিনের জন্য সেখানকার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। এ সময় আমি তাঁর সামনে দু'জন মানুষকেও ছোট-বড় কোন বিষয়ে বিবাদ করতে দেখিনি। আমরা আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, মানুষ পরস্পরের অধিকার আদায়ে ন্যায়নিষ্ঠ ছিল বলেই এমনটি ঘটেছিল।[৩]

শিক্ষা : সমাজে মানুষ যখন পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং ন্যায়বিচার ও ইনছাফের সঙ্গে আচরণ করে, তখন বিরোধ-বিবাদ কমে যায়। তাই শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু ন্যায়পরায়ণ বিচারকই যথেষ্ট নন; বরং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ, আমানতদারিতা ও অন্যের অধিকার রক্ষার মানসিকতা গড়ে তোলা যরূরী।

---

১. *খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ৫/৮০।*

২. *আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/২৮০।*

৩. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ২১/৪৬৮; তারীখু বাগদাদ ১০/২৮৫।*

সমালোচনার মজলিস

-সারওয়ার মিছবাহ

মাঝে মাঝে অবসাদের ছায়া মনটাকে ঘিরে ধরে। সকল কাজগুলো একঘেঁয়েমিতে রূপ নেয়। তখন যেন মনের আকাশ জুড়ে নেমে আসে বিনোদনের তৃষ্ণা। মন তখন ডুব দিতে চায় ভালোলাগার পুকুর ঘাটে। বিনোদনের এই তৃষ্ণা সবারই জাগে। কারো জাগে মাসে একবার। কারো সপ্তাহে। আমি এক বিক্ষিপ্ত মানুষ। আমার প্রতিদিনই জাগে। কিন্তু বিনোদন তো বেশ ব্যয়বহুল! এর জন্য খরচা আছে। সবাই কি সেই খরচা বইতে পারে? সবাই কি মন চাইলেই পসন্দের খাবার খেতে পারে? বেড়াতে যেতে পারে পাহাড়, সমুদ্র সৈকত বা অজানা কোন নদীর চরে? তাই আমার মত মানুষেরা গ্রহণ করে বিনা পয়সার বিনোদন। সেই অমূল্য বিনোদনের নাম হ'ল সমালোচনা।

বন্ধু মহলে সমালোচনায় আমার বেশ নাম-ডাক আছে। আমি যেভাবে রসিয়ে রসিয়ে সমালোচনা করতে পারি, তা আর পারে কয়জন? এজন্য বন্ধু মহলে আমাকে বলা হয়, 'বিশিষ্ট সমালোচক'। আমরা যখন কাজের ফাঁকে এক টেবিলে বসি, তখনই আমার কোন বন্ধু সমসাময়িক কোন ইস্যুর জের টেনে আমার নাম উপস্থাপন করে। বলে, 'সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী! এ পর্যায়ে অমুক বিষয়ে কথা বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি বিশিষ্ট সমালোচক জনাব অমুককে'। আমি মুচকি হেসে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সমালোচনা শুরু করি। সে কি হাসাহাসি চলে! লুটোপুটি চলে! গড়াগড়ি চলে! ঘড়ি-ঘণ্টার কোন হিসাবই তখন আমাদের থাকে না।

এই সমালোচনার মজলিস শুধু কাজের ফাঁকে জমে, এমন নয়। কখনো মসজিদ থেকে ছালাত আদায় করে বেরিয়ে। কখনো সন্ধ্যার পরে চায়ের দোকানে। তথাকথিত এই বিনোদন-মজলিস জমে ওঠে যে কোন সময়েই। আবার জমে উঠতে কোন সময় লাগে না। কোন বিষয় ঠিকও করে আসতে হয় না। কারণ সমালোচনার হাযারো বিষয় আমাদের মস্তিষ্কে সারাদিন আঁকিবুকি কাটতেই থাকে। কোন সহকর্মী কি করল। কর্তৃপক্ষ কি করল। এই আলোচনা নিয়েই আমার জীবন বেশ সুন্দর। সমালোচনা যদি না থাকত, তবে আমার একেকটা দিন হ'ত হাযার বছরের সমান। কি করে আমার দিন কাটত, আমি জানি না।

হঠাৎ সেদিন খেয়াল করলাম, সমালোচনা শুধু বিনোদন নয়, এটা আমার অস্ত্র। এটা আমার আশ্রয়। আমার কর্মস্থলে এমন কোন নিখুঁত কাজ আজ পর্যন্ত হয়নি, যাকে আমি সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করতে অপারগ হয়েছি। যখনই কোন কল্যাণকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, আমি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তার সমালোচনা করেছি। সহকর্মীদের কাছে করেছি। অধীনস্থদের কাছেও করেছি। এমনকি অপরিচিত ব্যক্তির কাছেও করেছি। যে ঐ মানুষটিকে চেনে না, তাকে চিনিয়ে দিয়েও তার কাছে সমালোচনা করেছি। আমার কোন সহকর্মীকে কোন ভাল কাজ করতে দেখলে বিভিন্ন তীর্যক মন্তব্য দিয়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছি। আঙ্গুল তুলে হেসেছি। এই ক্ষেত্রগুলোতে সমালোচনাকে আমি এক মহাস্ত্র হিসাবে ধারণ করেছি।

সমালোচনাকে কখনো আমি আশ্রয় হিসাবেও নিয়েছি। যখনই দেখেছি, আমি গতানুগতিক। আমার ঝুলি একদম শূন্য। তখনই আমি ঊর্ধ্বতনদের কাছে কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে বিপরীতদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছি। দেখানোর চেষ্টা করেছি, আমি গতানুগতিক নই, বরং আমি মৌলিক। আমি আদি ও আসল। যারা আধুনিকায়ন চায়, তাদের মাঝে হাযারো দোষ। তাদের মাঝে না আছে প্রজ্ঞা, আর না আছে ইনছাফ। তাদের শুধু দোষ আর দোষ। আর আমি এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

আমার স্বাদ নেয়া সকল আলাপের মাঝে সমালোচনা হ'ল সবচেয়ে মুখরোচক আলাপ। এই আলাপ নিয়ে আমি যার কাছেই উপস্থিত হয়েছি, সেই আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। চা খাইয়েছে। আমি দেখেছি, সমালোচনা শুধু আমার কাছেই নয়, সকলের কাছেই মুখরোচক। আর সেই সমালোচনা যদি হয় কোন সৎ ব্যক্তির। তাহ'লে তো জমেই গেল। এজন্যই হয়ত মিডিয়াগুলো সর্বদা এসব খবর খোঁজে। কে কোন্ ভাল কাজ করল, সেটা আমার কাছে মুখ্য নয়। কার কতটুকু পদস্খলন হ'ল, সেটাই আমি খুঁজে বেড়াই। কারণ মানুষ অভ্যাসগতভাবেই এগুলো শুনতে ভালোবাসে।

এভাবে মানুষের সমালোচনায় জীবন ক্ষয় করে আমার কোন লাভ হয়নি। বরং আমি শুধু হেরেছি, আর হারিয়েছি। হারিয়েছি অবস্থান ও সহাবস্থানের যোগ্যতা। আমি মানুষের কাছে একদম তেতো হয়ে গেছি। এই পরিস্থিতি আসার পূর্বেই হয়ত আমার বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখা উচিৎ ছিল, আমি বছরের পরে বছর মানুষের সমালোচনা করে দেশ-দশ বা নিজের কোন্ কল্যাণ সাধন করেছি? কোন্ অর্জনটি আমার ঝুলিতে এসেছে? এই সমালোচনাকেই কি রাসূল (ছাঃ) গীবত হিসাবে আখ্যায়িত করেননি? এটাই কি সেই পাপ নয়, যা যেনার চেয়েও নিকৃষ্ট? আমি তা থেকে নিজেকে কতটুকু বাঁচাতে পেরেছি?

আমি জনসচেতনতার দোহাই দিয়ে সমালোচনা করেছি। আমি ইছলাহ-কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে দ্বীনদার ব্যক্তিদের কাছে মানুষের সমালোচনা করেছি। আমি কি কখনো ভেবেছি যে, তার ইছলাহের দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন কি-না? ইছলাহ-এর আর কোন নববী পদ্ধতি ছিল কি-না? সমালোচনা দিয়ে কি কখনো সংশোধন আশা করা যায়? আল্লাহ কি আমাকে হাশরের ময়দানে বলবেন যে, 'অমুকের মধ্যে এই দোষ ছিল। তুমি তার সমালোচনা করে জনসচেতনতা বাড়ালে না কেন'? এই দায়িত্ব কি আমার? আমি কেন এই কাজ করতে গেলাম?

আমি তো দুনিয়াতে এসেছি জান্নাত অর্জনের জন্য। আমি মুসলমান মানেই আমি সর্বদা একজন যোদ্ধা। আমার কিসের এত অধিকারের লড়াই? কোন নেতা কি করল, কোন সরকার কি করল, কর্মক্ষেত্রে কে কি করল তা নিয়ে আমার কেন এত

মাথাব্যথা? আমি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য দুনিয়াতে অবস্থান করছি। আমার রিযিক নির্ধারিত। আমার মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারিত। এই দুনিয়ার সকল ভাষাই আমার ভাষা। সমস্ত যমীন আমার সিজদার স্থান। আমি প্রতিদিন রাতে মারা যাই। ফজরে আমি নতুন জীবন নিয়ে উঠি। আমি তো এই দুনিয়ায় অবদান রাখতে এসেছি। কুড়াতে নয়, বিলাতে এসেছি। যে সর্বস্ব বিলাতে আসে তার কিসের প্রাপ্তির হিসাব? আমার পাওয়া-না পাওয়ার কি আছে? আমি কেন মানুষের সমালোচনা করতে যাব?

মুসলমান হিসাবে যাদের সাথে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব, ধাপে ধাপে আমি তাদেরই শারণাপন্ন। আমি ইসলাম বিদ্বেষী লেখকের সমালোচনা করি। আবার সাহিত্য শিখতে আমি তার লেখাই পড়ি। কারণ আমাদের কোন লেখক নেই। আমি ইসলাম বিদ্বেষী পত্রিকার সমালোচনা করি। আবার মানসম্মত পত্রিকা হিসাবে সেটাই আমি টাকা দিয়ে কিনে পড়ি। কারণ আমাদের আন্তর্জাতিক মানের কোন পত্রিকা নেই। আমাদের কারিকুলাম নেই, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নেই, আমাদের প্রচার মাধ্যম নেই, আমাদের কলমের ধার নেই, আমাদের কথায় কোন লজিক নেই। যারা টকশোতে বসে ইসলাম নিয়ে বাজে মন্তব্য করে, আমরা পর্দার এপাশে তাদের সমালোচনা করি। তাদের সাথে বসে আধা ঘণ্টা বিতর্ক করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমরা শুধু পারি একে অপরের পেছনে লেগে থাকতে আর সমালোচনা করতে।

আমার মুখ থেকে হাসি মুছে যাওয়ার জন্য এই সংকটগুলো কি যথেষ্ট ছিল না? আরো কতটা নিঃস্ব হওয়ার পরে আমি নিজের শুন্যতা অনুভব করতে পারব? আমার তো সমালোচনা দূরে থাক, নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকার কথা নয়। কারণ ইসলাম বিদ্বেষীদের সমালোচনা করে কি হবে? আমি তাদের সামনে ইসলামী সংস্কৃতির সাম্রাজ্য গড়ে তুলব। আমি কেন বলব, অমুক লেখক ইসলাম বিদ্বেষী? আমি এমন একশো লেখক তৈরী করব যারা চিন্তাধারায় হবে ইসলামপন্থী আর ভাষায় হবে কিংবদন্তী। আমি কখনো তীব্র নিন্দা জানাবো না। আমি কারো অনুগ্রহ চাইব না। আমি নীরবে নিভৃতে সৈনিক তৈরী করে যাব। যারা কনস্টান্টিনোপলের অভেদ্য প্রাচীরের সামনে হঠাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করবে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ-এর একশোটি তোপ হয়ে। সেদিন ঐ অভেদ্য প্রাচীর গুড়িয়ে দেয়া হবে। আমি কেন সমালোচনা করে সময় নষ্ট করব? আমি কেন তীব্র নিন্দা জানাব?

আমি কোন খারাপের সমালোচনা না করে এত ভাল ছড়িয়ে দেব, যার সয়লাবে খারাপ খড়কুটোর মত ভেসে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমি আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, যতই যা হয়ে যাক, মুখে-কলমে কারো সমালোচনা করব না। যদি কখনো কারো সমালোচনা করে ফেলি তবে তার কাছে ক্ষমা চাইব। কমপক্ষে তিনটি সমমানের মজলিসে তার প্রশংসা করব। এটা আমার শাস্তি। আমার ইছলাহ। আমি ভাল দিয়ে খারাপকে ঢেকে দেব নীরবে। অবদানে অবদানে সাজিয়ে তুলব এই পৃথিবী। আমি এমন এক বিপ্লবের প্রহর গুনে সময় কাটাব, যে বিপ্লব হবে একটি ঢেউয়ের মত। যে ঢেউয়ে কোন গর্জন থাকবে না। কোন গতি থাকবে না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। বড় বড় দালান-কোঠা, পাহাড়-পর্বত তার নীচে তলিয়ে যাবে। যাবতীয় অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব হবে মূসা (আঃ)-এর লাঠির মত। যে এগুলোকে নীরবে গিলে ফেলবে ইনশাআল্লাহ। সেই স্বপ্ন দেখে যাব। স্বপ্ন দেখিয়ে যাব। এই দুর্বল মানুষটি সর্বদা আপনার দো'আপ্রার্থী।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

দারুল আবরার লাইব্রেরী
এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

দারুস সুন্নাহ শপ
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
যোগাযোগ করুন :
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪
অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop
সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন (নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

আদর্শ সন্তান গঠনে পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম*

(গত সংখ্যার পর)

১৪. সন্তানের সঙ্গে শুধু ফলাফল নিয়ে কথা বলা :

নম্বর একটি পরীক্ষার ফল জানায় আর চরিত্র বাড়ায় পুরো জীবনের মান। অনেক পরিবারে দিনের প্রথম প্রশ্ন হয়, কত নম্বর পেয়েছ? কোন বিষয়ে ফেল করলে মনে করা হয়, সে যেন জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শুরু হয় বকাবকি, এমনকি মারধরও। এ সময় অনেক সন্তান আত্মহননের পথও বেছে নেয়। অথচ পরীক্ষা জীবনের একটি ক্ষুদ্র পাঠ মাত্র। সে এবার খারাপ করেছে, আগামীতে ভাল করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুব কমই জিজ্ঞেস করা হয়, 'আজ কি ভাল কাজ করেছ? সময়মতো ছালাত আদায় করেছ কি? সকাল-সন্ধ্যার দো'আগুলো পাঠ করেছ কি?

কেবল ফলাফলকে গুরুত্ব দিলে সন্তান মনে করে তার মূল্য কেবল ফলাফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধীরে ধীরে সে ভাল মানুষ হওয়ার চেয়ে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার প্রতিযোগিতায় বেশী মনোযোগী হয়ে ওঠে। অনেক অভিভাবক সন্তানদের সামনে অন্যের সন্তানের পদমর্যাদা এবং দুনিয়াবী সুনাম-সুখ্যাতি এত বেশী আলোচনা করেন যে, সন্তানের মাথায় পরকালীন চিন্তা-ভাবনা একেবারেই ম্লান হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে ফেলে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে-ই, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল'।[১] তাই সন্তানের পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে তার চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৫. সন্তানের ভাল কাজের প্রশংসা ও উৎসাহ না দেওয়া :

ভাল কাজের স্বীকৃতি একটি শিশুর অন্তরে আরও ভাল হওয়ার শক্তি জাগিয়ে তোলে। শুধু ভুল ধরলে সন্তান সংশোধিত হয় না; বরং অনেক সময় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ছোট ছোট ভাল কাজও যদি আন্তরিকভাবে প্রশংসা করা হয়, তবে সে আনন্দের সঙ্গে সেই কাজ বারবার করতে চায়। একটি সুন্দর বাক্য অনেক সময় দীর্ঘ উপদেশের চেয়েও বেশী কার্যকর। সন্তানের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেওয়া ও তাকে ভাল কাজে উৎসাহিত করার শিক্ষা ইসলামের সামগ্রিক নির্দেশনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত হ'তে পারে কি?' *(রহমান ৫৫/৬০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে (আমরা তাদের পুরস্কৃত করি)। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তার পুরস্কার বিনষ্ট করি না' *(কাহফ ১৮/৩০)*। মানুষের ভাল কাজের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ، 'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'।[২] তাই সন্তানের ভাল কাজের যথাযথ প্রশংসা করা উচিত। যাতে সে আরও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়। একটি আন্তরিক প্রশংসা আরও অনেক ভাল কাজের বীজ বপন করে দেয়।

১৬. সন্তানের সঙ্গে অন্যের তুলনা করা :

প্রত্যেক শিশুই আল্লাহ্র দেওয়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কারও স্মরণশক্তি প্রখর, কারও বিশ্লেষণক্ষমতা ভাল, আবার কেউ নেতৃত্ব বা অন্য কোন গুণে এগিয়ে থাকে। তাই বারবার অন্য শিশুর সঙ্গে তুলনা করলে সন্তান নিজের ভাল দিকগুলো ভুলে গিয়ে দুর্বলতাগুলোকেই বড় করে দেখতে শুরু করে। এতে তার আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং সে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একই রকম যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকের মেধা ও সামর্থ্যে রয়েছে ভিন্নতা। কেউ জ্ঞানচর্চায় দক্ষ, কেউ কারিগরি কাজে পারদর্শী, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যে সফল, আবার কেউ কৃষি, নির্মাণ বা সেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বৈচিত্র্যই সমাজের পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণ করে এবং জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখে। সবাই যদি একই গুণ ও দক্ষতার অধিকারী হ'ত, তাহ'লে সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় কাজের ব্যবস্থা ব্যাহত হ'ত। আর এ বৈচিত্র্যই মহান রবের পরিকল্পনার অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، 'তবে কি তারা তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে? আমিই তো তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে পরস্পরে মর্যাদায় উন্নত করি। যাতে তারা পরস্পরে কাজ নিতে পারে। বস্তুতঃ তারা যা সঞ্চয় করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনেক উত্তম' *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। তাই সন্তানকে তার নিজস্ব প্রতিভা ও সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা উচিত। একই সঙ্গে তাকে অন্যের সঙ্গে নয়, বরং নিজের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে শেখানো প্রয়োজন।

---

* কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

১. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

২. তিরমিযী হা/১৯৫৫; ছহীহাহ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৩০২৫।

গতকালের তুলনায় আজ কতটা ভাল হ'তে পেরেছে, নতুন কি শিখতে পেরেছে এবং নিজের ভুল কতটা সংশোধন করতে পেরেছে এসব বিষয়ই হোক তার সামনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য।

১৭. সন্তানের যোগ্যতা না বুঝে নিজের স্বপ্ন চাপিয়ে দেওয়া :

অনেক পিতা-মাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেন নিজের অপূর্ণ ইচ্ছার ভিত্তিতে। অথচ যে পথে শিশুর মন নেই, সে পথে তার পদচারণাও ভারী হয়ে যায়। আগ্রহহীন সাফল্যের চেয়ে আগ্রহপূর্ণ সাধনা অনেক বেশী ফলপ্রসূ। ইসলামও মানুষের সামর্থ্য ও সক্ষমতার প্রতি সম্মান দেখাতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، 'তোমারা সহজ কর, কঠিন কর না; সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি কর না'।[৩] সন্তানের পথচলায় অভিভাবকের দায়িত্ব হ'ল তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং তার ভবিষ্যত পথচলা যেন তার সামর্থ্য ও বৈধ আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে সহায়তা করা।

১৮. অতিরিক্ত আদর :

সন্তানকে ভালবাসা মানে তার সব ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। ছোটবেলায় যে ভুলকে হাসিমুখে ছেড়ে দেওয়া হয়, বড় হ'লে সেটিই অনেকক্ষেত্রে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সন্তানের ভুলের পরিণতি বুঝতে শেখানো না হ'লে তার মধ্যে দায়িত্ববোধের পরিবর্তে ছাড় পাওয়ার মানসিকতা তৈরী হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে দাদা-দাদী ও নানা-নানীর অতিরিক্ত স্নেহও কখনো কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা আদরের বশে সন্তানকে শাসন করতে নিষেধ করেন। অথচ ভালবাসার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও শাসনও থাকা দরকার। রাসূল (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে যখন ইয়ামনে গভর্নর করে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাঁকে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে দু'টি ছিল, وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِى اللهِ، 'তাদেরকে (সন্তানদেরকে) আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য লাঠি নামিয়ে রাখবে না এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে শেখাবে'।[৪] তাই সন্তানকে ভালবাসার ভাষা কোমল হ'তে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আজকের সঠিক সংশোধনই আগামী দিনের সুন্দর চরিত্র ও দায়িত্বশীলতা গঠনের অন্যতম মাধ্যম।

১৯. সব চাওয়া সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করা :

সন্তানের প্রতিটি আবদার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করলে সে ধীরে ধীরে প্রয়োজন ও বিলাসিতার পার্থক্য ভুলে যায়। তখন না পাওয়া তার কাছে শিক্ষা নয়, বরং অসহ্য কষ্ট মনে হয়। অথচ জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনেই ধৈর্য, অপেক্ষা ও আত্মসংযমের প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَا مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، 'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নে'মত কাউকে দেওয়া হয়নি'।[৫] তাই সব ইচ্ছা পূরণ করার চেয়ে অপেক্ষা করতে শেখানো অনেক বড় উপহার। কারণ ধৈর্যই মানুষকে আত্মসংযমী ও সহনশীল হ'তে শেখায়।

২০. সন্তানকে দায়িত্বশীল হ'তে সুযোগ না দেওয়া :

অনেক অভিভাবক সন্তানের প্রতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তার সব কাজ নিজেরাই করে দেন। এতে শিশুটি স্বাচ্ছন্দ্য পায়, কিন্তু দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হারায়। ছোট ছোট দায়িত্বই একদিন তাকে পরিশ্রমী ও জবাবদিহিমূলক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، 'মানুষের জন্য তাই আছে, যার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'।[৬] আজ যে সন্তান নিজের ছোট দায়িত্ব পালন করতে শেখে, আগামীকাল সে সন্তানই পরিবার, সমাজ ও উম্মাহর বড় দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে বহন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

২১. অন্ধ পক্ষপাতিত্ব :

সন্তান ভুল করলে অনেক অভিভাবক সত্য জানার আগেই তার পক্ষ নেন। এতে শিশুর মনে একটি বিপজ্জনক ধারণা জন্ম নেয় যে, আমি ভুল করলেও আমাকে রক্ষা করা হবে। এভাবে ভুলের সংশোধনের পরিবর্তে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অথচ প্রকৃত ভালবাসা সন্তানের সম্মান রক্ষা করার পাশাপাশি তার চরিত্রও রক্ষা করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*। কুরায়েশ বংশের মাখযূম গোত্রের জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করলে তার পক্ষে সুফারিশের জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) উসামা বিন যায়েদকে বলেন, তুমি আমার নিকট

৩. *বুখারী হা/৬৯; মুসলিম হা/১৭৩৪।*
৪. *আহমাদ ২২১২৮; মিশকাত হা/৬১।*
৫. *বুখারী হা/১৪৬৯; মুসলিম হা/১০৫৩।*
৬. *বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯।*

আল্লাহর দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বেকার জাতি ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ‘যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার উপরে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ’লে আমি তার হাত কেটে দিতাম’।[৭] সুতরাং সন্তানকে সব সময় রক্ষা করার চেষ্টা নয়; সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস শেখানো উচিত। এ শিক্ষাই তাকে ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে।

২২. ভুল করলে ক্ষমা চাইতে না শেখানো :

ভুল করা মানুষের স্বভাব, কিন্তু ভুল স্বীকার করা চরিত্রের শক্তি। যে শিশু নিজের ভুলের দায় নিতে শেখে না, সে বড় হয়েও দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর অভ্যাস গড়ে তোলে। অথচ আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া মানুষকে ছোট করে না; বরং তার মর্যাদা বাড়ায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا، ‘যে কেউ মন্দকর্ম করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসাবে পাবে’ *(নিসা ৪/১১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক আদমসন্তান ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী সেই, যে তওবা করে’।[৮] সন্তানকে শুধু দুঃখিত বলতে নয়, নিজের ভুল সংশোধনের দায়িত্বও নিতে শেখানো উচিত। এ অভ্যাস তাকে সম্মানিত করবে।

২৩. বড়দের প্রতি সম্মানবোধ না শেখানো :

সম্মানবোধ কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নয়। এটি পরিবারের প্রতিদিনের আচরণে গড়ে ওঠে। শিশু যদি দেখে বড়দের সঙ্গে রূঢ় আচরণেও কেউ আপত্তি করছে না, তবে সে সেটিকেই স্বাভাবিক মনে করবে। এক সময় একই আচরণ সে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সমাজের অন্যদের সঙ্গেও করতে শুরু করবে। তাই ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে বড়দের সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলা, তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، ‘তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, (নিঃস্ব) পথিক ও তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও আত্মম্ভরীকে ভালবাসেন না’ *(নিসা ৪/৩৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، ‘যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ‘নিশ্চয়ই প্রবীণ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত’।[১০] বড়দের সম্মান করতে শেখা শুধু শিষ্টাচার নয়; এটি একটি ঈমানী গুণ, যা মানুষের চরিত্রকে মহিমান্বিত করে।

২৪. সন্তানকে লুকিয়ে কিছু খেতে বা করতে শেখানো :

অসততার শিক্ষা সব ক্ষেত্রে বড় অপরাধ দিয়ে নয়, ছোট অভ্যাস দিয়েই শুরু হয়। অনেক সময় সন্তানকে বলা হয় কাউকে বলবে না, লুকিয়ে খাও বা লুকিয়ে কর এ ধরনের কথাগুলো শিশুর কাছে সহজ মনে হ’লেও তার মনে গোপনীয়তার ভুল ধারণা তৈরী করতে পারে। ধীরে ধীরে সে বুঝতে শেখে, পরিবারের একজনের কাছ থেকেও সত্য লুকানো স্বাভাবিক। পরে এই অভ্যাসই বড় বিষয়ে অসততার পথ খুলে দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না’ *(আনফাল ৮/২৭)*। যে পরিবারে সত্য লুকানো নয়, বরং সত্য বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে সেই পরিবারেই বিশ্বাসের ভিত্তি সবচেয়ে মযবূত হয়।

২৫. পরিবারে কৃতজ্ঞতার চর্চা না থাকা :

যে শিশু প্রতিটি নে‘মতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে শেখে এবং মানুষের উপকারের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার মধ্যে বিনয় ও কৃতজ্ঞতাবোধ গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতার চর্চা না থাকলে প্রাপ্তির চেয়ে অপূর্ণতাই তার চোখে বড় হয়ে ওঠে। অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নে‘মত ও অনুগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ’লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ’লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর’ *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ‘যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না’।[১১]

---

৭. *বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮; মিশকাত হা/৩৬১০।*
৮. *তিরমিযী হা/২৪৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৩৯।*
৯. *আবুদাঊদ হা/৪৯৩৯; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহাহ হা/২১৯৬।*
১০. *আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৪৮১১; আহমাদ হা/৭৯২৬; ছহীহাহ হা/৪১৬।*

যে ঘরে *'আলহামদুলিল্লাহ'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) ও *'জাযাকাল্ল-হু খয়রান'* (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) উচ্চারিত হয়, সে ঘরে সন্তুষ্টি, সৌহার্দ্য ও বরকতের আবহও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

২৬. সন্তানের সামনে গীবত, সমালোচনা ও গালমন্দ করা :

পরিবারে যদি প্রতিনিয়ত আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা অন্যের দোষচর্চা, গীবত ও কটু ভাষা চলতে থাকে, তবে শিশুও এটিকে স্বাভাবিক আচরণ মনে করে নেয়। অজান্তেই তার জিহ্বা সমালোচনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সুন্দর চরিত্রের জায়গা দখল করে নেয় নেতিবাচক মনোভাব। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، 'আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করোনা এবং পরস্পরের পিছনে গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পসন্দ করে? বস্তুত তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، 'মুসলমানতো সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[১২] তাই শিশুর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত, যা শুনে তার মুখেও দো'আ, সত্য ও সৌজন্যের শব্দ ফুটে ওঠে।

২৭. ভাল পরিবেশ ও সৎ মানুষের সান্নিধ্যের অভাব :

খারাপ পরিবেশ থেকে সন্তানকে দূরে রাখাই যথেষ্ট নয়; ভাল পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করানোও প্রয়োজন। যে শিশু আলেম, সৎ মানুষ, মসজিদ, ইসলামী অনুষ্ঠান, বই ও সেবামূলক কাজের পরিবেশে বড় হয়, তার সামনে জীবনের আদর্শও ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সৎ ও সত্যবাদী মানুষের সঙ্গ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। তাই সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই সৎ ও আদর্শবান মানুষের সান্নিধ্যে রাখা প্রয়োজন। কারণ সৎ মানুষের সাহচর্য তার চিন্তা, চরিত্র ও জীবন গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তাকে ভবিষ্যতে একজন আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

২৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে সন্তানকে দূরে রাখা :

যে শিশু আত্মীয়তার উষ্ণতা পায় না, তার সামাজিক অনুভূতিও অপূর্ণ থেকে যেতে পারে। আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি ভালবাসা, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ ও পারিবারিক বন্ধনের এক জীবন্ত শিক্ষা। দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-মামা ও আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ শিশুর হৃদয়ে মমত্ববোধ সৃষ্টি করে এবং তাকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে দূরে রাখে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এ সম্পর্কের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، 'যে চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে'।[১৩] তাই সন্তানকে আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়। বরং ছোটবেলা থেকেই তাকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে, আত্মীয়দের খোঁজখবর নিতে এবং বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে শেখানো প্রয়োজন। আপনার দেওয়া এই শিক্ষা সন্তানের হৃদয়ে পারিবারিক ভালবাসা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় করবে।

২৯. সময়ানুবর্তিতা শেখাতে অবহেলা :

শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ছোট ছোট অভ্যাস দিয়েই শুরু হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত, পড়াশোনা, ঘুম, খাবার ও দৈনন্দিন কাজের অভ্যাস শিশুর মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কর্মনিষ্ঠা গড়ে তোলে। আর সময়ের প্রতি অবহেলা ধীরে ধীরে তাকে অগোছালো ও দায়িত্বহীন করে দেয়। সময় যে মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ এবং এর যথাযথ ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের সাফল্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময় ও জীবনের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে জবাবদিহির গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত আদম সন্তান স্বীয় রবের নিকট থেকে পা সরাতে পারবে না। ১- তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা অতিবাহিত করেছিল। ২- তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা নিঃশেষ করেছিল। ৩- তার সম্পদ সম্পর্কে, কোন পথে তাতে উপার্জন করেছিল এবং ৪- কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫- তার ইলম সম্পর্কে, ইলম অনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না'।[১৪] তাই সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই সময়ের মূল্য বুঝতে, প্রতিটি কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে শেখানো উচিত।

[ক্রমশ:]

১২. *বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪০; তিরমিযী হা/২৪৮১।*

১৩. *বুখারী হা/২০৬৭; মুসলিম হা/২৫৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৫২০।*
১৪. *তিরমিযী হা/২৪১৬; ছহীহুত তারগীব হা/১২৬।*

কাগজের ফুল

-সারওয়ার মিছবাহ

শিমুলতলী গ্রাম। প্রতি শুক্রবার বটতলায় হাট বসে। হাট হ'লেও তা যেন বড় কোন মেলার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। ধুলো আর কোলাহলে মুখর চারপাশ। নাগরদোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ আর খেলনার দোকানের মনকাড়া বিভিন্ন আওয়াজে এক উৎসবমুখর পরিবেশ। ভীড়ের মাঝে আট বছরের ছোট্ট ছেলে রেযওয়ানের হাত শক্ত করে ধরে হাঁটছিলেন রহমতুল্লাহ। হঠাৎ একটি খেলনার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াল রেযওয়ান। দোকানের একপাশে বাঁশের কাঠিতে থরে থরে সাজানো লাল, নীল, হলুদ রঙের চমৎকার সব কাগজের গোলাপ।

রেযওয়ানের চোখ বিস্ময়ে চকচক করে উঠল। পিতার হাত ধরে টান দিয়ে সে বলল, 'আব্বু, দেখ! কি দারুণ গোলাপ! আমাদের উঠানের গাছটার চেয়ে কত বড়, আর কি টুকটুকে লাল! আমাকে একটা কিনে দেবে'? রহমতুল্লাহ ছেলের উচ্ছ্বাস দেখে হাসলেন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'না রে বাজান। আমাদের উঠানের গোলাপটা হ'ল সত্যিকারের গোলাপ। তার নিজস্ব সুবাস আছে, প্রাণ আছে। আর এটা হ'ল কাগজের গোলাপ। দেখতে যতই চকচকে হোক, এর কোন ঘ্রাণ নেই'।

রেযওয়ান গাল ফুলিয়ে বলল, 'তো কি হয়েছে? দেখো না! দেখতে কত সুন্দর লাগছে'! রহমতুল্লাহ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেকে বোঝানোর সুরে বললেন, 'এটা শুধু দিনের পর দিন ঘরের কোণে সাজিয়ে রাখার জন্যই সুন্দর আব্বু। এই গোলাপ দিয়ে কখনো গোলাপ জল তৈরী হয় না। যা কাজে আসে না, যার ভেতর কোন নির্যাস নেই, তার সৌন্দর্য কেবলই ধোঁকা'। ছোট্ট রেযওয়ান সেদিন বাপের কথার গভীরতা বুঝতে পারেনি। তবে হাট থেকে ফেরার পরও সেই কাগজের ফুলের উজ্জ্বল রং তার মনে গেঁথে ছিল অনেক দিন পর্যন্ত।

রহমতুল্লাহ শিমুলতলী গ্রামের একজন অতি সাধারণ ভ্যানচালক। পিতা-মাতা শখ করে সুন্দর একটি নাম রাখলেও, সমাজের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন স্রেফ 'ভেইন্যা রহমত'। কারণ তার কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না, আবার সহায়-সম্পদের দাপটও ছিল না। ফলে পদে পদে তাকে তাচ্ছিল্য আর অবহেলার শিকার হতে হ'ত। এজন্য রহমতুল্লাহর মনে বড় সাধ ছিল, একটা পুত্র সন্তান হ'লে তাকে তিনি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। এতে তার যতই কষ্ট স্বীকার করতে হোক না কেন।

অভাবের সংসারে একদিন তার কোল আলো করে জন্ম নিল ফুটফুটে রেযওয়ান। রহমতুল্লাহ নিজের জীবনের সব না-পাওয়ার হিসাব ভুলে গেলেন। সবকিছুকে পেছনে ফেলে এখন তার জীবনের একটাই লক্ষ্য, ছেলেকে তিনি অনেক বড় আলেম, একজন বড় দাঈ বানাবেন। এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, যেন তার দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জীবনই সুন্দর হয়। সমাজের কেউ যেন তার ছেলেকে অবহেলার চোখে দেখতে না পারে।

রেযওয়ান তখন সবেমাত্র প্রাইমারী শেষ করেছে। রহমতুল্লাহ ভাবলেন, ছেলেকে বড় করতে হ'লে এখন থেকেই কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাতে হবে। এই বিষয়ে দেরী করলে চলবে না। তিনি একদিন সময় করে শহরে গেলেন। নামজাদা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে দেখলেন। কোথায় ছেলেকে রাখলে ভাল হবে। কোথায় কত খরচ হবে, সবই জানলেন। শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো এতই ব্যয়বহুল, তার মত ভ্যানচালকের সেখানে কোন হিসাব-নিকাশ নেই।

তবে রাস্তায় একজন সামান্য ভ্যানওয়ালা হ'লেও এখানে তো তিনি একজন যোদ্ধা। লৌহ-কপাটের মত অভেদ্য যে যোদ্ধার বুক। যেখানে ভয় ও নিরাশার কোন স্থান নেই। যেখানে অদূর ভবিষ্যতের আশাগুলো হিমালয়ের মত স্থির হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই রহমতুল্লাহ তো পিছপা হওয়ার মত মানুষ নন। টাকা যতই লাগুক, তিনি তো এই অসাধ্য সাধন করেই ছাড়বেন। প্রয়োজনে নিজের রক্ত বেচবেন, মানুষের কাছে হাত পাতবেন। কিন্তু ছেলেকে তিনি বড় করবেনই।

ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় রহমতুল্লাহ তাকে শহরের একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করালেন। সেখানে পড়াশোনার খরচ অনেক। যেদিন রেযওয়ান ভর্তি হ'তে গেল সেদিন অফিসে দেখল, তার পিতা অনেকগুলো ৫০০ আর হাযার টাকার নোট বের করে সেই মানুষটিকে দিচ্ছেন। তার পিতার কাছে এত টাকা আছে! সে অবাক হয়। অথচ আগের দিনই আব্বু আম্মুকে বলছিলেন, বাজারে মাছের কেজি তিনশো টাকা! আমরা কি আর অত টাকা দিয়ে মাছ খেতে পারি! তাহ'লে কি আব্বু মিথ্যা বলেছিলেন! রেযওয়ানের হিসাব মেলে না।

রেযওয়ান পড়ার টেবিলে বসল। আর পিতা বসলেন ভ্যানের সিটে। রেযওয়ান কলম ধরল, আর পিতা তার রুক্ষ পা জোড়া রাখলেন ভ্যানের প্যাডেলে। শুরু হ'ল সংগ্রাম। একদিকে জীবনে বড় হওয়ার, অন্যদিকে ছেলের বেতন জোগানোর সংগ্রাম। রেযওয়ান যখন খেতে যায়, তখন দেখে বড় একটা মাছের টুকরা, পুরোটাই তার। একটা পূর্ণ ডিম তাকে খেতে দেয়া হয়। অথচ সে বাড়িতে তার বাপ-মাকে একটা ডিম অর্ধেক করে খেতে দেখেছে। সে সপ্তাহে দু'দিন গোশত খায়। অথচ তার বাড়িতে মাস চলে যায়, গোশত রান্না হয় না।

দিনে দিনে সে বুঝতে পারে, তাকে বড় করতে তার পরিবার সামর্থ্যের বাইরে এসে যুদ্ধে নেমেছে। সে জানতে পেরেছে, তার বাপ নাকি এখন অনেক রাত পর্যন্ত ভ্যান চালান। বাড়িতে মা সেলাই মেশিনের কাজ করেন। তবে তাদের যে কষ্ট হয়, এটা তারা কখনোই প্রকাশ করেন না। রেযওয়ান যখন রাতে ঘুমাতে যায়, তখন বাপের হাড়ভাঙা খাটুনি তার চোখে ভাসে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, বাবা-মায়ের এই পরিশ্রম সে কোনভাবেই বৃথা যেতে দেবে না।

রেযওয়ান পড়শোনায় বেশ ভাল। তারপরও সে শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করেই সবকিছু করে। শিক্ষকদের কাছে জানতে চায়, 'উস্তায, জীবনে সফল হ'তে হ'লে আমাকে কি করতে হবে? কিভাবে পড়লে আমি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব'? শিক্ষকরা তাকে চিরাচরিত সেই উত্তরই দেন। তারা বলেন, 'পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। পাঠ্যবইগুলো একেবারে মুখস্থ করে ফেলবে। খাতায় যত নিখুঁতভাবে লিখতে পারবে, নম্বর তত বেশী আসবে। আর ভালো ফলাফল মানেই সফল জীবন'।

রেযওয়ান এই কথাগুলোকে মাথায় বসিয়ে নেয়। দিন-রাত এক করে সে পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা, প্রতিটি লাইন তোতাপাখির মত মুখস্থ করতে শুরু করে। তার একটাই লক্ষ্য, যেকোন মূল্যে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতে হবে। তাকে পরীক্ষায় প্রমাণ করতে হবে যে, সে সবচেয়ে মেধাবী। সেসব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে লাগল। কারণ প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষায় রয়েছে ১০০ নম্বর।

অথচ একসময় রেযওয়ানের নিজেরও একটা শখ ছিল। সে যখন গ্রামে ছিল, তখন কাঠ আর কঞ্চি কেটে দারুণ সব খেলনা আর যন্ত্র বানাতে পারত। তার খুব আগ্রহ ছিল নতুন কিছু তৈরী করার। কিন্তু শহরের এই নামীদামী প্রতিষ্ঠানে সেই আগ্রহের কোন মূল্য নেই। একদিন বিজ্ঞানের একটি প্রজেক্টে সে নিজের হাতে তৈরী একটি যন্ত্র নিয়ে গেল। সে ভেবেছিল উস্তায খুব খুশি হবেন। কিন্তু উস্তায তাকে বললেন, 'এসব খেলনা বানিয়ে সময় নষ্ট করলে পরীক্ষায় গোল্ডেন মার্কস আসবে না। বইয়ের পড়ায় মন দাও'।

সেদিন রেযওয়ান বুঝতে পারল, নিজের আগ্রহ আর সৃজনশীলতা দিয়ে এখানে প্রথম হওয়া যায় না। যে ছেলেটি না বুঝে কেবল মুখস্থ করে খাতায় উগরে দেয়, সেই এখানে সেরা। তাই সেও নিজের ভেতরের সেই কারিগর সত্তাকে গলা টিপে হত্যা করল। সে মনে করে নিয়েছিল, পড়াটাই মূল। ভালভাবে বই পড়লে এর চেয়ে ভাল মানের কাজ আমার মাধ্যমে হবে। তার মাথায় কেবল একটিই টার্গেট, সার্টিফিকেটে গোল্ডেন মার্কস নিয়ে পিতার মুখে হাসি ফোটাতে হবে।

এভাবেই দিন যেতে থাকল। একসময় রেযওয়ানের লেখাপড়ার অধ্যায় শেষ হ'ল। তার হাতে এখন দারুণ সব রেজাল্টের চকচকে সনদপত্র। এবার সময় এসেছে একটা ভালো চাকরি নিয়ে পিতার স্বপ্ন পূরণ করার। গ্রামে তার হারানো সম্মানকে ফিরিয়ে দেয়ার। তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার যথাযথ মূল্য বুঝিয়ে দেয়ার। বাপ-মায়ের ঘাড় থেকে পরিশ্রমের বোঝা নামিয়ে তাদেরকে সুখ-শান্তির সন্ধান দেয়ার।

কিন্তু যখনই রেযওয়ান তার সেই স্বপ্নের রঙিন খাম নিয়ে বাস্তবের চাকরির বাজারে পা রাখল, তখনই তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কারণ তার কাছে প্রতিটি বিষয়ই ছিল ১০০ নম্বরের। সব বিষয় সমান তালে পড়ে সে না হয়েছে মাওলানা, না হয়েছে ভিন্নকিছু। সে যেখানেই কাজ নিতে যায়, সেখানেই তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তীক্ষ্ণ কিছু প্রশ্ন। তাকে বলা হয়, 'আপনার পরীক্ষার রেজাল্ট তো চমৎকার, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল স্কিল কি আছে? এই বিষয়ে আপনার বিশেষত্ব বা দক্ষতা কি? আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কি করতে পারবেন'?

সেদিন একটি বড় কোম্পানীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ভাইভার জন্য ডাক পড়েছিল রেযওয়ানের। বোর্ড মেম্বার তার রেজাল্ট দেখে বেশ মুগ্ধই হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একজন অফিসার তাকে একটি প্রজেক্টের ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার তো রেজাল্ট চমৎকার। আচ্ছা, আমাদের এই প্রজেক্টের একটি সমস্যা এখানে দেওয়া আছে। আপনি যদি আমাদের কর্মী হ'তেন, তবে কিভাবে এটি সমাধান করতেন'? রেযওয়ানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কারণ বইয়ের পাতায় সে এরকম কোন সমস্যার কথা পড়েনি।

সে আমতা আমতা করে বইয়ের কিছু মুখস্থ থিওরী আওড়ানোর চেষ্টা করল। অফিসার মুচকি হেসে ফাইলটা টেনে নিয়ে বললেন, 'আমরা থিওরী শুনতে চাইনি তরুণ, আমরা সমাধান চেয়েছিলাম'। রেযওয়ান সেদিন মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসেছিল। কারণ সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা তাকে শুধু তথ্য গিলতে শিখিয়েছে, তা প্রয়োগ করতে শেখায়নি। তাই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী অসংখ্য জায়গায় আবেদন করেও সে বারবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে লাগল।

সে বুঝতে পারল, কর্মজীবন বড় নিষ্ঠুর। সে আবেগকে চেনে না। সে জানে না, কে রেযওয়ান আর কে রহমতুল্লাহ। তাদের গল্প শোনার কোন আগ্রহ তার নেই। সে চিনে কেবল যোগ্যতা, দক্ষতা আর নতুনত্ব। সে কাগজের সনদপত্র চেনে না। সে কেবল চেনে সময় অনুযায়ী কর্মীর উপযুক্ততা। এখানে কেউ যদি জায়গা করে নিতে চায়, তবে যোগ্যতার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে জায়গা দখল করতে হবে। অন্যথা এক বিঘত জায়গাও কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না। বরং দখলে নেয়া জায়গাও ছিনিয়ে নিতে হাযার জোড়া চোখ সবসময় উৎসুক হয়ে থাকবে।

দিনটি ছিল কাঠফাটা রোদ্দুরের এক ভরদুপুর। টানা কয়েকটি ইন্টারভিউ থেকে রেযওয়ান আজকেও রিজেক্ট হয়েছে। ক্লান্ত, শ্রান্ত আর হতাশ রেযওয়ান রাস্তার ধারের একটি টং দোকানে বসে এক কাপ চা আর একটা শুকনো পাউরুটি চিবোচ্ছিল। হঠাৎ ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। রাস্তার ওপাশেই একটি বড় মাদ্রাসা। গেট খুলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একঝাঁক প্রাণোচ্ছল ছাত্র। তাদের চোখেমুখে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন। একে অপরের সাথে খোশগল্পে মেতে আছে তারা।

রেযওয়ান চায়ে চুমুক দিয়ে তাদের দিকে একমনে তাকিয়ে রইল। নিজের অতীতের কথা মনে পড়ে গেল। একসময় সেও ঠিক এভাবেই হাসিমুখে গেট দিয়ে বের হ'ত। এই ছেলেগুলোও হয়ত এখন ভাবছে, বইয়ের পাতাগুলো ঠিকঠাক মুখস্থ করে গেলেই পড়াশোনা শেষে এক জাদুর কাঠির

ছোঁয়ায় তাদের জীবন সুখের হয়ে যাবে। ওরা জানে না, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার শেষে কত বড়, কত নির্মম এক পরীক্ষা এই পৃথিবীর পথে পথে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রেযওয়ান চোখ নামিয়ে নিল। চোখ গেল নিজের পাশে রাখা প্লাস্টিকের ফাইলটির দিকে। ফোল্ডারের ভেতর থেকে যেন উঁকি দিচ্ছে তার জীবনের এত বছরের সাধনার চকচকে সব সনদপত্র। নম্বর আর গ্রেডে ভরপুর এই কাগজগুলো আজ তার কাছে বড়ই অচেনা, বড়ই অর্থহীন মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার স্মৃতির মণিকোঠায় ভেসে উঠল বহু বছর আগের সেই বটতলার হাটের দৃশ্য। পিতার সেই মায়াবী কণ্ঠস্বর যেন তার কানের কাছে অনুরণিত হ'তে লাগল, 'কাগজের গোলাপ দিয়ে কখনো গোলাপ জল তৈরী হয় না বাবা। যা কাজে আসে না, তার সৌন্দর্য কেবলই ধোঁকা'।

ততক্ষণ রেযওয়ানের চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার এই কাড়ি কাড়ি সনদপত্রগুলো আজ সেই কাগজের ফুলের মতই মূল্যহীন। এগুলো দেখতে সুন্দর। ফ্রেমবন্দি করে সাজিয়ে রাখার মত। তবে এর ভেতরে বাস্তব জীবনের কোন ঘ্রাণ নেই। কোন নির্যাস নেই। সে মনে মনে ভাবল, আমি বা আমার পিতা কেউই হয়ত শিক্ষা সম্পর্কে বুঝতাম না। কিন্তু আমার শিক্ষকগণও কি বুঝতেন না? নাকি তারাও এই অন্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কাছে যিম্মি ছিলেন? তারা তো কেবল এই বিশাল কারখানার এক একজন শ্রমিক মাত্র, যে কারখানা দিনের পর দিন কেবল কাগজের ফুলই তৈরী করে যাচ্ছে। আমার পিতা তাদের কি ক্ষতি করেছিলেন? একটা গোটা পরিবারের পরিশ্রম শুধু একটি ভুল পদ্ধতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে গেল! আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়া এই বিশাল ক্ষতির ক্ষতিপূরণের কোন আইনও সংবিধানে নেই!

তার চোখদু'টো আবার ঝাপসা হয়ে আসে। সে দূর আকাশের নীল দিকে তাকায়। হয়ত নীলের ঐপাশে কি আছে, সেটা দেখার চেষ্টা করে। তার চোখে ভাসে পিতার বুড়িয়ে যাওয়া মুখখানা। যে চেহারা একসময় কত চঞ্চল থাকত। ভবিষ্যতের গল্প শোনাত। সেই মুখখানা আজ অনেকটাই নীরব হয়ে গেছে। চোখে ভাসে মায়ের কোমরব্যথার দামী দামী ঔষধগুলো। আর নিজের জীবনের অনেকগুলো নির্ঘুম রাত আর রিক্ত-নিঃশ্ব দু'টি হাত।

টং দোকানদারের কথায় সম্বিত ফিরে আসে রেজয়ানের। 'মামা! এত মন দিয়া কি ভাবেন? আর কিছু লইবেন'? রেযওয়ান না সূচক মাথা নাড়ায়। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। চা-পাউরুটির বিল চুকিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে চলে যায়। কিছু দূরে রাস্তার বাঁকটা পার হয়ে রেযওয়ান হারিয়ে যায়। রেযওয়ানেরা হারিয়ে যায়। সত্যিই হারিয়ে যায়। ওদিকে রাস্তার ঐপাশের ইট-পাথরের নামীদামী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন রেযওয়ানের অপেক্ষায় থাকে।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ATAB MEMBER Biman Bangladesh Airlines

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সন্তুবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

মৌসুমী ভাইরাসজনিত জ্বর : আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতা ও সঠিক যত্ন

*ডা. মেহেদী হাসান মুনিম**

ভাইরাসের সংক্রমণে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সাধারণভাবে তাকে ভাইরাসজনিত জ্বর বা Viral Fever বলা হয়। এটি কোন নির্দিষ্ট রোগের নাম নয়; বরং বিভিন্ন ভাইরাসের সংক্রমণে দেখা দেওয়া একটি সাধারণ উপসর্গ। ঋতু পরিবর্তন, বর্ষাকাল ও শ্বাসতন্ত্রের ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে গেলে এ ধরনের জ্বর বেশী দেখা যায়।

ভাইরাসজনিত জ্বরের কারণ :

বিভিন্ন ভাইরাস এর কারণ হ'তে পারে। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, অ্যাডেনোভাইরাস, এন্টারোভাইরাস, SARS-CoV-2 (COVID-19-এর কারণ) এবং শিশুদের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণকারী বিভিন্ন ভাইরাস। ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা সক্রিয় হয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় জ্বর হ'তে পারে।

সাধারণ উপসর্গ :

ভাইরাসের ধরন ও আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স অনুযায়ী উপসর্গ ভিন্ন হ'তে পারে। সাধারণত জ্বর, মাথাব্যথা ও শরীরব্যথা, দুর্বলতা ও অবসাদ, সর্দি-কাশি ও গলাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বা ডায়রিয়া, চোখ লাল হওয়া বা পানি পড়া এবং কিছু ক্ষেত্রে ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা যায়। শিশুদের খিটখিটে ভাব, দুর্বলতা ও খাবারে অনীহা হ'তে পারে। তবে শুধু উপসর্গ দেখে নির্দিষ্ট ভাইরাস শনাক্ত করা যায় না।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা :

ডেঙ্গুতে উচ্চ জ্বরের সঙ্গে মাথাব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, শরীর ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, বমি বমি ভাব ও র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। জ্বর কমে গেলেই বিপদ কেটে গেছে এমনটি মনে করা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে জ্বর কমার সময়ই ডেঙ্গুর ঝুঁকিপূর্ণ (critical) পর্যায় শুরু হয়। চিকুনগুনিয়ায় জ্বরের সঙ্গে তীব্র অস্থিসন্ধির ব্যথা, অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা ও র‍্যাশ হ'তে পারে এবং ব্যথা দীর্ঘদিন স্থায়ীও হ'তে পারে।

যে পরীক্ষা প্রয়োজন :

শুধু জ্বর হ'লেই অনেকগুলো পরীক্ষা একসঙ্গে করানোর প্রয়োজন নেই। রোগীর বয়স, উপসর্গ, জ্বরের স্থায়িত্ব ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় রোগের সংক্রমণ বিবেচনায় চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নির্ধারণ করেন। প্রয়োজনে CBC, ডেঙ্গুর NS1 antigen/IgM, চিকুনগুনিয়ার পরীক্ষা, COVID-19-এর antigen test বা RT-PCR এবং শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়ার সন্দেহে Chest X-ray করা যেতে পারে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা যেমন অনর্থক খরচ ও উদ্বেগ বাড়ায়, তেমনি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা না করানোও বিপজ্জনক হ'তে পারে।

চিকিৎসা ও করণীয় :

অধিকাংশ সাধারণ ভাইরাসজনিত সংক্রমণে নির্দিষ্ট কোন অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের প্রয়োজন হয় না। রোগের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা ভিন্ন হ'তে পারে। তবে সাধারণভাবে নিম্নে বিষয়গুলো উপকারী-

১. পর্যাপ্ত বিশ্রাম : শরীরকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে হবে এবং অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলা উচিত।

২. পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ : পানি, স্যুপ, ওরস্যালাইনসহ উপযুক্ত তরল খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বমি বা ডায়রিয়া থাকলে পানিশূন্যতা রোধে ওরস্যালাইন গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. জ্বর ও ব্যথায় প্যারাসিটামল : জ্বর বা শরীরব্যথায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্যারাসিটামল গ্রহণ করা যেতে পারে। ডেঙ্গুর আশঙ্কা থাকলে অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন বা অন্যান্য NSAID জাতীয় ব্যথানাশক ঔষধ এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ এগুলো রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। জ্বরের অস্বস্তি কমাতে প্রয়োজন হ'লে স্বাভাবিক বা হালকা কুসুম গরম পানিতে শরীর মুছে দেওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪. নিজের ইচ্ছায় অ্যান্টিবায়োটিক নয় : ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। তাই সাধারণ ভাইরাসজনিত জ্বরে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের সন্দেহ থাকলে চিকিৎসক প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন।

৫. কাশি-সর্দির ওষুধে সতর্কতা : কাশি বা সর্দির জন্য বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। বয়স ও শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া নিরাপদ।

৬. ডেঙ্গুতে জ্বর কমলেই বিপদ কাটে না : ডেঙ্গুতে জ্বর কমে যাওয়াকে সবসময় সুস্থতার লক্ষণ মনে করা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে জ্বর কমার সময়ই ডেঙ্গুর ঝুঁকিপূর্ণ (critical) পর্যায় শুরু হ'তে পারে। এ সময় তীব্র পেটব্যথা, বারবার বমি, রক্তপাত, অস্বাভাবিক দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট বা অস্থিরতা দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। তাই জ্বর কমে যাওয়ার পরও অন্তত পরবর্তী ২৪-৪৮ ঘণ্টা রোগীর অবস্থা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা যরূরী।

কখন দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন?

শ্বাসকষ্ট বা অস্বাভাবিক দ্রুত শ্বাস, বুকে ব্যথা, অস্বাভাবিক ঘুমঘুম ভাব/বিভ্রান্তি/অজ্ঞান বা খিঁচুনি, তীব্র বা বাড়তে থাকা পেটব্যথা, বারবার বমি, কিছু খেতে বা পান করতে না পারা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা পানিশূন্যতার লক্ষণ, নাক-মাড়ি দিয়ে রক্তপাত, রক্তবমি বা কালো পায়খানা, অস্বাভাবিক র‍্যাশের সঙ্গে দ্রুত অবনতি এবং জ্বরের সঙ্গে শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হ'লে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে। শিশু, বয়স্ক ও গুরুতর অন্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা প্রয়োজন।

ভাইরাসজনিত জ্বর প্রতিরোধে করণীয় :

নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে, অসুস্থ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। কাশি-হাঁচির সময় মুখ ও নাক ঢেকে রাখতে হবে। নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস ও মশার কামড় থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা ও COVID-19-এর টিকা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শেষ কথা :

জ্বর হ'লেই একে 'সাধারণ ভাইরাস জ্বর' ধরে অবহেলা করা ঠিক নয়। আবার অযথা একের পর এক পরীক্ষা করানোও সমীচীন নয়। রোগীর বয়স, উপসর্গ, জ্বরের ধরন ও স্থায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কারণ নির্ণয় করাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক পর্যবেক্ষণ যরূরী। সর্বোপরি নিজ সিদ্ধান্তে অ্যান্টিবায়োটিক বা অপ্রয়োজনীয় ব্যথানাশক ঔষধ পরিহার করতে হবে এবং কোন বিপদচিহ্ন দেখা দিলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে।

* *সহকারী রেজিস্ট্রার, সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।*

কবিতা

পরনিন্দাকারী

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন, ঢাকা।

সামনে পেছনে যারা করে পরনিন্দা,
দুর্ভোগ তাদের নিশ্চিত হয়, না শরমিন্দা।
গুনে গুনে কুক্ষিগত করে বিপুল সম্পদ
তারও ধ্বংস অনিবার্য, হয় মহাবিপদ।
ভাবে সে, এ ধন-সম্পদ থাকবে চিরকাল
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, খোলা তাদের কপাল;
কক্ষনো নয়! নিক্ষিপ্ত হবে সে হুতামায়,
চিরকাল সেথায় জ্বলবে সে অগ্নিশিখায়।
হুতামা কি? মানুষ জানে কি তার ঠিক অর্থ?
এটি আল্লাহ্র প্রজ্বলিত আগুনের গর্ত।
যা অবশ্য ভেদ করে অন্তরের অন্তঃস্থল,
করে ঘেরাও বয়ে আনে সকল অমঙ্গল।
উচ্চ স্তম্ভে তারা থাকবে বাধা অনন্তকাল
দুর্ভোগ পোহাবে শুধু এমন মন্দ কপাল।

নিখোঁজপত্র

-মুনতাহিম আদীব, রাজশাহী।

নিখোঁজপত্রে ছেয়ে গেছে গোটা শহর
অথচ আমি তখনো আছি বর্তমান,
কালো আঁধারে ঢেকেছে যখন নগর
আলোর খোঁজে তখনো তোমরা নিষ্প্রাণ!
সত্য জেনে আলেয়ার পিছে ছুটে
নেই সমাধান কোন মেকি তন্ত্রে মন্ত্রে,
নিশ্চুপে শুধু সম্ভাবনারা যায় টুটে
শাসক তবু আনে না দ্বীন রাষ্ট্রযন্ত্রে।
হারানো বিজ্ঞপ্তিতে শহর দাও ছেয়ে
তবুও আমি হবো না কভু দৃশ্যমান,
ইসলামহীনে ভিনদেশী মই বেয়ে
পাবে না মোরে রইলে কোন পিছুটান।
আমি সমাধান। মোরে খুঁজে পেতে হ'লে
আগে দ্বীনে ফেরো সব তন্ত্র-মন্ত্র ভুলে।

নফসের দিনলিপি

-আমাতুল্লাহ ফারাহ,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুহূর্তেরা সরে যায়, নিমেষ এবং পলকও
জীবনীশক্তি ফুরায়, চেহারার ঝলকও!
চলে যায় দিন হায়াতের প্রতিক্ষণ,
আমলবিহীন পাপমগ্ন এমন।
চলে যায় রাত ফের আসে প্রভাত,
বিছানায় হয়ে কাত, আলসেমি করে আঁতাত।
চলে যায় সপ্তাহ চলে যায় মাস,
ভাবে না তো কেহ তার শেষ নিঃশ্বাস!
চলে যায় বছর চলে যায় যুগ,
কতগুলো পুরান কবর খেয়ে ফেলে উচ্ছুগ!
চলে আসে ডাক, শূন্য উত্তরপত্র আমার,
অথচ শেষ ঘণ্টা পিয়ন বাজায় নির্বাক।
নির্লজ্জের মত তবু অবাধ্য নফসখানি,
জানাশোনা উত্তর কভু লেখে না, হবে তার মানহানি।
আজরাঈলের ডাকে অর্পিতে অর্পিতে হাত,
কেন যে ভাবতেই থাকে মু'মিনূনের ৯৯ আয়াত!

কার হুকুমে

-মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান,
দিনাজপুর।

ভোরবেলাতে সূর্য ওঠে, রাত্রিবেলা চাঁদ;
জানো কি ভাই কার হুকুমে হচ্ছে দিনরাত?
কার হুকুমে পাতা গজায়, জীর্ণ পাতা ঝরে?
কার হুকুমে মেঘের থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে?
মাঠের বুকে ফসল ফলে টক ও মিষ্টি স্বাদ,
কার হুকুমে মাছে ভরে সাগর-নদী খাদ?
কার হুকুমে তারায় তারায় সাজে রাতের আকাশ?
কার হুকুমে মন ছুঁয়ে যায় স্নিগ্ধ শীতল বাতাস?
কার হুকুমে পাখি পেল মিষ্টি সুরের জাদু?
কার হুকুমে ফুল পেল তার সুঘ্রাণ আর মধু?
মৌমাছিরা কার হুকুমে মধুর চাক বোনে?
নিরাময় কে লুকিয়ে রাখে এই মধুরই কোণে?
তিনি মোদের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তাঁহার নাম;
সারা বিশ্বের সকল কিছু তাঁর হুকুমের গোলাম।

হ'তে হবে সেরা

-সামীউল ইসলাম, নীলফামারী।

মন থেকে মুছে ফেল সকল সংশয়,
যদি হ'তে চাও তুমি সেরা একজন;
ভয়-ভীতি মাড়ানোর সাহসটা চাই-
কঠোর ও দৃঢ় মন খুব প্রয়োজন।
এই পথে কেউ কারো সহযোগী নয়,
সহজেই মেনে নিতে চাইবে না কেউ;
চারপাশ থেকে শুধু ধেয়ে আসবেই-
শত শত বাধা আর বিভীষিকা-ঢেউ।
মনে রেখো চিরদিন এই পৃথিবীতে,
কেউ তোমায় দেবে না তো জায়গা করে;
বুকে নিয়ে হাযারও আঘাতের কাঁটা-
নিজেকেই নিতে হবে নিজ হাতে গড়ে।
বুকে আজ বেঁধে নাও দৃঢ়তার দানা,
মন থেকে পণ করো বড় যে হওয়ার;
ভুল থেকে শিখে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে-
বিজয়ের রথে তুমি হও আজ সওয়ার।

স্বদেশ

পরকালে বিশ্বাসে এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ, তলানীতে চীন

পরকালে বিশ্বাসের দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস সার্ভে' (২০১৭-২০২২)-এর হালনাগাদ উপাত্তের ভিত্তিতে সংবাদ এজেন্সি 'সোসিয়া এশিয়া স্ট্যাটস' সম্প্রতি এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯৮.৮% মানুষই পরকালীন জীবনে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। এই তালিকায় বাংলাদেশের পরেই রয়েছে যথাক্রমে তুরস্ক ৯১.৮%, ইরান ৯১.৩% ও পাকিস্তান ৮৯.৩%। এছাড়া ফিলিপাইনে ৮৩.৮%, মালয়েশিয়ায় ৮১.৯% এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৭৩.৫% মানুষ পরকালে বিশ্বাসী। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী জীবনধারার প্রভাবে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এই হার তুলনামূলক অনেক কম। থাইল্যান্ডে ৫৭.১%, ভিয়েতনামে ৩৪.১% এবং জাপানে মাত্র ৩২.২% মানুষ পরকালে বিশ্বাসী। আর মাত্র ১১.৫% নিয়ে এই তালিকার একেবারে তলানীতে রয়েছে চীন। বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের কাছে পরকালীন বিশ্বাস দৈনন্দিন জীবনে ন্যায়-অন্যায় বোধ ও নৈতিকতার এক বিশাল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে।

গত ৬০ বছরে শাক-সবজির পুষ্টিগুণ কমেছে ৫০ শতাংশ

গত ৬০ বছর আগের তুলনায় আধুনিক শাক-সবজিতে পুষ্টি উপাদান উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে। জার্নাল অব দ্য আমেরিকান সোসাইটি ফর হর্টিকালচারাল সায়েন্সে প্রকাশিত গবেষণা এবং ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দ্রুত বর্ধনশীল জাতের উদ্ভাবন ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতির কারণে ফসলে খনিজ ও ভিটামিনের ঘনত্ব ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ১৯৫০ ও ১৯৯৯ সালের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৪৩টি ফসলের পুষ্টিমান তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে প্রোটিন ৬ শতাংশ, ক্যালসিয়াম ১৬ শতাংশ, আয়রন ১৫ শতাংশ এবং ভিটামিন সি ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিপ সায়েন্স ভেঞ্চারসের মতে ১৯৬০-এর দশকে যে পরিমাণ পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা কপার পাওয়া যেত, বর্তমানে সেই পরিমাণ খনিজ পেতে দ্বিগুণ সবজি খেতে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু ফসলে পুষ্টির ঘনত্ব ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, অধিক ফলনশীল জাতের সবজি দ্রুত বাড়লেও প্রতি গ্রাম সবজিতে পুষ্টির ঘনত্ব কমে যায়। এর পাশাপাশি মাটির উর্বরতা হ্রাস, রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং সংরক্ষণের ত্রুটির কারণেও ভিটামিন নষ্ট হচ্ছে। তবে পুষ্টিবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পুষ্টি কিছুটা কমলেও দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য আনা এবং পর্যাপ্ত তাজা ও মৌসুমী শাকসবজি খাওয়ার কোন বিকল্প নেই।

রাজধানীর বুকে ৭৫ টাকায় দুই সন্তানের জন্ম! সস্তায় মিলছে উন্নত চিকিৎসাসেবা

ঢাকা শহরে সন্তান জন্মদানের জন্য অনেকেরই লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। অনেকে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন বলেও পত্রিকায় রিপোর্ট এসেছে। অথচ মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা এক স্কুলশিক্ষিকার দুই সন্তানের জন্মে খরচ হয়েছে মাত্র ৭৫ টাকা! প্রথমটিতে ১০ টাকা এবং দ্বিতীয়টিতে যরূরী সেবা নিতে হওয়ায় ৬৫ টাকার টিকিট কাটতে হয়েছিল বলে খরচ সামান্য বেড়েছে। রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত 'মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল'-এর ভেতরে প্রবেশ করলেই পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস, সবুজ মাঠ আর গাছপালা যেন রোগীদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। অন্যান্য সরকারী হাসপাতালের চিরচেনা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরিচ্ছন্নতা কিংবা দালালদের দৌরাত্ম্য এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফদের আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ সেবাগ্রহীতারা। হাসপাতালটিতে স্বাভাবিক প্রসবেই বেশী উৎসাহ দেওয়া হয়। তবে কারও অবস্থা সংকটাপন্ন হ'লে তখন চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের কথা ভাবেন। প্রতিদিন প্রায় ৮০০ থেকে এক হাযার রোগী এখান থেকে প্রসূতি, টিকাদান ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। হাসপাতালের পরিচালক ডা. মুনীরুয্যামান সিদ্দিকী জানান, সরকার নির্ধারিত ফির বাইরে এখানে কোন অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয় না। এর মধ্যে আউটডোর টিকিট ৫ টাকা এবং ভর্তি হ'লে ১০ টাকার টিকিট কাটতে হয়। আর যদি কেবিন ভাড়া নিতে হয় তবে খাবারসহ ২৫০ টাকা। কেবিনে থাকা অবস্থায় যদি স্বাভাবিক প্রসব হয় তাহ'লে কোন চার্জ হবে না। কেবলমাত্র অস্ত্রোপচার হ'লে অপারেশন থিয়েটারের জন্য সরকার নির্ধারিত ২ হাযার টাকা খরচ হয়। অপরদিকে সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা কোন নারীর অস্ত্রোপচারের জন্য কোন খরচ দিতে হবে না, সব ফ্রি। আলট্রাসনোগ্রাম ১২০ টাকা। রাজধানীর নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের জন্য এই হাসপাতালটি এক বড় আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদেশ

ল্যাপটপ-ট্যাবলেট বাদ দিয়ে পুনরায় বইয়ের যুগে ফিরছে সুইডেন

একসময় ক্লাসরুমে ট্যাবলেট ও ল্যাপটপ ব্যবহারের কারণে সুইডেনের স্কুলগুলোর বেশ প্রশংসা করা হ'ত। ২০০০ সালে ক্লাসরুম আধুনিক করার লক্ষ্যে ডিজিটাল শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এসব ডিভাইস চালু করা হ'লেও ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। এর আগে সুইডেনের শিক্ষার্থীদের পড়ার মান ইউরোপের মধ্যে সেরা থাকলেও, প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারে তা চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১২ সালের 'পিসা' (PISA) আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের পড়ার মান, গণিত ও বিজ্ঞানের দক্ষতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। গবেষণায় দেখা গেছে, ডিভাইসে বেশীক্ষণ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ার ক্ষমতা ও গভীর মনোযোগ কমে যায়। পাশাপাশি হাতে লেখার বদলে কি-বোর্ডে টাইপ করায় তাদের স্মরণশক্তি লোপ পাচ্ছে। এছাড়া পড়াশোনার চেয়ে গেম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দিকে ঝোঁক বেড়ে যাওয়ায় ক্লাসের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং পরীক্ষার ফলাফলেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেও সঠিকভাবে পড়তে বা লিখতে পারছে না। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় গণদাবীর মুখে বই আবার ক্লাসরুমে ফিরে এসেছে এবং এর সুফলও মিলতে শুরু করেছে। শিক্ষার্থীদের পড়ার মান আবারও উন্নত হচ্ছে। পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ১০ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য দেশজুড়ে বই পড়ার প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী বই পড়া শিক্ষার্থীর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষাখাতে সরকারী বাজেট বাড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের লাইব্রেরিগুলোকেও উন্নত করা হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হ'ল, ছোট বাচ্চাদের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে কেবল বড় শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী এর সীমিত ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে।

পিতা-মাতার জন্য চাকরী ছাড়লেন মাইক্রোসফটের ভাইস প্রেসিডেন্ট

পেশাগত সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার পরও নাড়ীর টান যে কতটা গভীর হ'তে পারে, তারই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মার্কিন টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফটের প্রকৌশল বিভাগের এই ভাইস প্রেসিডেন্ট কেশবন শানমুগাম। ক্যারিয়ারের মোহ আর সফলতার চাকচিক্যকে তুচ্ছ করে, কেবল বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সময় দিতে দীর্ঘ ২৩ বছরের চাকরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিঙ্কডইনে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, মাইক্রোসফট ছেড়ে আসাটা ছিল একটি কঠিন সিদ্ধান্ত । কারণ এক্সেল কো-পাইলটের কাজ এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করাটা তিনি বেশ উপভোগ করতেন। তবে পিতা-মাতার সঙ্গে আরও বেশী সময় কাটানোকেই তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছেন। এমন একটি মানবিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় তিনি মাইক্রোসফটের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। ক্যারিয়ার ও বিলাসবহুল জীবনের চেয়ে বৃদ্ধ বাপ-মাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্তের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেটিজেনরা তার ভূয়সী প্রশংসা করছেন এবং এটিকে জীবনের অন্যতম সেরা কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[আমরাও তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ঘটনার মধ্যে নামধারী মুসলিম ধনিক শ্রেণীর এবং বৃদ্ধ বাপ-মায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে (স.স.)]

বিশ্বে প্রতি পাঁচ প্লেট খাবারের এক প্লেটই অপচয়!

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ইউএনইপি-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর ১০৫ কোটি টন খাবার অপচয় হয়। অর্থাৎ পাঁচ প্লেট খাবারের প্রায় এক প্লেটই শেষ পর্যন্ত ডাস্টবিনে ফেলা হয়। অপচয়কৃত এসব খাবারের ৬০ শতাংশই ফেলা হয় বাসাবাড়ি থেকে। এছাড়া রেস্তোরাঁ থেকে ২৮ শতাংশ এবং দোকান থেকে ১২ শতাংশ খাবার ফেলে দেওয়া হয়। এই বিপুল পরিমাণ খাবার বহন করতে ২০ টন ধারণক্ষমতার প্রায় ৫ কোটি ২৫ লাখ ট্রাক প্রয়োজন। বিশ্বে একজন মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ১৩২ কেজি খাবার অপচয় করেন। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, মাথাপিছু খাবার অপচয়ের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মালদ্বীপ। দেশটিতে একজন মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ২৬০ কেজি খাবার অপচয় করেন, যা বিশ্ব গড়ের প্রায় দ্বিগুণ।

অথচ একদিকে যখন বিপুল পরিমাণ খাবার নষ্ট হচ্ছে, তখন জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭.৮ শতাংশ বা প্রায় ৬৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ক্ষুধার মুখে ছিল। এর মধ্যে আফ্রিকাতেই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। যেখানে প্রতি পাঁচজনে একজন পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পায় না। বিশ্বের মোট ক্ষুধার্ত মানুষের প্রায় অর্ধেকই এ মহাদেশের বাসিন্দা। এছাড়া এশিয়ায় প্রায় ২৯ কোটি ২০ লাখ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য নষ্ট ও অপচয়ের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশী ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি ফেলে দেওয়া খাবারের পচা মিথেন গ্যাস পরিবেশ ও আবহাওয়ার ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

[আল্লাহ বলেন, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' (বনু ইস্রাঈল ১৭/২৭)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কারো (খাবারের) লোকমা যদি নিচে পড়ে যায়, তবে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে কোন ময়লা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়; শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে' (মুসলিম হা/২০৩৩; মিশকাত হা/৪১৬৭)। অথচ মুসলমানরাও এটি করে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। বিশেষ করে হোটেল মালিকরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাদের সাবধান হওয়া উচিৎ (স.স.)]

মুসলিম জাহান

প্রতিদিন ৫ হাযার সিঁড়ি বেয়ে ছালাত পড়াতে যান যে তুর্কী ইমাম

প্রতিদিন প্রায় ৫ হাযার সিঁড়ি বেয়ে খাড়া ও দুর্গম পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে তুরস্কের ঐতিহাসিক ভান দুর্গের চূড়ায় পৌঁছান ইমাম ছিবগাতুল্লাহ বিলমেজ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দুর্গের চূড়ায় অবস্থিত সুলায়মান খান মসজিদে পৌঁছানোর পর সেখানে আযান দেওয়া, ছালাতের ইমামতি করা এবং তুরস্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা দর্শনার্থীদের সেবা দেওয়াই তার মূল কাজ। স্বেচ্ছায় ও অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে কাজ করছেন জানিয়ে ছিবগাতুল্লাহ বলেন, দুর্গম এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলে ক্লান্তি আসাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু কাজটি তিনি বেশ উপভোগ করেন। নিয়ম অনুযায়ী যোহরের আগেই পাহাড়ী পথ বেয়ে মসজিদে পৌঁছে যান তিনি এবং মাগরিবের ছালাত শেষে নিচে নেমে আসেন। দুর্গম অবস্থানের কারণে যাতায়াত কষ্টকর হওয়ায় এশা ও ফজরে সেখানে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় না। ১৫৩৪ সালে ওছমানীয় সুলতান সুলায়মান এই মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন, যা মাত্র তিন বছর আগে মুছল্লীদের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করা হয়। ছিবগাতুল্লাহ ইমামতির পাশাপাশি বিদেশী পর্যটকদের কাছে মসজিদটির ইতিহাস তুলে ধরেন এবং ইসলাম সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। বিশ্বের নানা প্রান্তের পর্যটকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার ইংরেজি ভাষারও দারুণ উন্নতি হয়েছে। অক্লান্ত যাত্রার পর দুর্গের চূড়ার নয়নাভিরাম দৃশ্য তার সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। দর্শনার্থীদের ভালোবাসা ও দো'আই তার জীবনের সেরা প্রাপ্তি বলে জানান ছিবগাতুল্লাহ।

[রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, মুওয়াযযিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে, সে ২৫ বা ২৭ ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাবে। মুওয়াযযিনও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে এবং তার আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হবে' (আবুদাঊদ হা/৫১৫; নাসাঈ হা/৬৪৫; মিশকাত হা/৬৬৭)। আল্লাহ উক্ত মুওয়াযযিন ও ইমামের অতুল্য সেবা কবুল করুন এবং অন্যান্য মুওয়াযযিন ও ইমাম এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃত্রিম দাঁত নয়, ওষুধেই গজাবে নতুন দাঁত

স্থায়ী দাঁত পড়ে গেলে সাধারণত কৃত্রিম দাঁত বা ডেন্টাল ইমপ্ল্যান্টের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে দাঁত হারানোর এই চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা জাগিয়েছেন জাপানের একদল গবেষক। তাঁরা 'টিআরজি০৩৫' নামের এমন একটি পরীক্ষামূলক ওষুধ নিয়ে কাজ করছেন, যা মানুষের শরীরে প্রাকৃতিকভাবে নতুন দাঁত গজাতে সাহায্য করবে। গবেষকদের মতে, এই ওষুধটি মূলত 'ইউএসএজি-১' নামের একটি প্রোটিনের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে শরীরে নতুন দাঁত গজানোর প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে। ইতিপূর্বে প্রাণীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় সফলতা পাওয়ার পর বর্তমানে মানবদেহে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা যাচাইয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের চূড়ান্ত ফলাফল ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের ওপর ভিত্তি করে ২০৩০ সালের মধ্যে যুগান্তকারী এই চিকিৎসাপদ্ধতিটি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হ'তে পারে। গবেষণাটি সফল হ'লে কৃত্রিম দাঁত বা ইমপ্ল্যান্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দন্ত চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

সোনামণি

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৬

৯ই অক্টোবর শুক্রবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে '২৪তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তরুণ হাসান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা মুশফিকুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, বর্তমান সভাপতি আহমাদুল্লাহ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, নাবীল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান জাহান বখ্শ, বগুড়া হেরিটেজ আইডিয়াল একাডেমীর প্রিন্সিপাল ড. মীযানুর রহমান ও রাজশাহী মারকায সাংগঠনিক যেলার পরিচালক ফায়ছাল আহমাদ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের মধ্যে। তাঁর সঠিক জীবনাদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্যই আমরা কারাগারের অন্ধ কুঠরীতে বসে সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) লিখেছিলাম। দো'জাহানে মুক্তি পেতে আমাদের সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পড়তে হবে এবং সেই আলোকে জীবন গড়তে হবে। শিশু-কিশোরদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমরা ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোনামণি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আজকের সোনামণি আগামী দিনের 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন' এবং জাতির কর্ণধার। আমাদের উচিত তাদের যথাযথ সময় দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। যাতে তারা আগামী দিনে সমাজে আলো জ্বালাতে পারে। সবশেষে তিনি সম্মেলনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে ২৪টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি সদস্য অংশগ্রহণ করে। সোনামণি বালিকা সদস্যারা ও তাদের অভিভাবিকাগণ মারকাযের বালিকা শাখায় অবস্থান করেন ও সেখানেই তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনের পুরা অনুষ্ঠান প্রজেক্টরের মাধ্যমে বালিকা শাখায় সম্প্রচার করা হয়।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয মুহাম্মাদ হুযায়ফা (পাবনা) এবং জাগরণী পরিবেশন করে শিবলী নো'মান (রাজশাহী)। সম্মেলনে ১ জন যুবসংঘ সদস্য সহ 'সোনামণি' মারকায শাখার ৮ জন সদস্য মিলে 'জীবনের কর্মফল' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ও শিক্ষণীয় 'সংলাপ' পরিবেশন করে। যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও সারওয়ার মিছবাহ।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৫৫ জন বালক ও ১০৫ জন বালিকা সহ ২৬০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২১ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১ম স্থান অধিকারীকে নগদ ১০,০০০ (দশ হাযার) টাকা, ২য় স্থান অধিকারীকে ৮,০০০ (আট হাযার) টাকা ও ৩য় স্থান অধিকারীকে ৬,০০০ (ছয় হাযার) টাকাসহ ক্রেস্ট, কলম, বার্ষিক সোনামণি ক্যালেন্ডার, চাবির রিং ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল।-

গ্রুপ-ক : বিষয় : দ্বীনিয়াত (হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ, ঈমান, ইসলাম ও আখলাক)।

বালক : ১ম : খন্দকার তালহা জুবায়ের (দারুলহাদীছ সালাফিইয়া মাদ্রাসা, বাইগুনী, গাবতলী, বগুড়া), ২য় : মুবাশশির আল-মুবীন (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আনন্দনগর, নওগাঁ), ৩য় : ইব্রাহীম (ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : শারাফ নওয়ার (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২য় : আয়াত বিনতু ওবায়দুল্লাহ (হাদীছ ফাউণ্ডেশন ইসলামিক একাডেমী, কাজলা, মতিহার, রাজশাহী), ৩য় : তাছফিয়া আখতার (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী আব্দুল আযীয আফিয়া মহিলা মাদ্রাসা, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা)।

গ্রুপ-খ : বিষয় : দ্বীনিয়াত (হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ, ঈমান, ইসলাম ও আখলাক)।

বালক : ১ম : মুহাম্মাদ হুযায়ফা (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২য় : আব্দুল কাদের জিহাদ (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা), ৩য় : তাজবীর হাসান সিজান (আল-হেরা আহলেহাদীছ মাদ্রাসা, খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : মুসাম্মাৎ শারিকা আখতার (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা, গাবতলী, বগুড়া), ২য় : মুসাম্মাৎ আমিনা শেখ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী), ৩য় : মুসাম্মাৎ আবিদা সুলতানা মুন্নী (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা),

নওদাপাড়া, রাজশাহী)।

গ্রুপ-গ : বিষয় : দ্বীনিয়াত (হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ, ঈমান, ইসলাম ও আখলাক)।

বালক : ১ম : মুহাম্মাদ আবুযার (নূর একাডেমী, নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২য় : ফরহাদ আহমাদ (শাহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলারোয়া, সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ (নিশ্চিন্তপুর নাইট মক্তব, বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : ফায়যা ইসলাম (জুনারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেরখাদা, খুলনা), ২য় : সামিরা খাতুন, কাঁকনহাট আইডিয়াল স্কুল, গোদাগাদী, রাজশাহী, ৩য় : নাবীহা নাওয়ার আফরা (লালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটোর)।

গ্রুপ-ঘ : বিষয় : সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : শিবলী নো'মান (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-নাজীব, (আল-হেরা আহলেহাদীছ মাদ্রাসা, খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ রুফাইদ তাবীব (দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী যেলাভিত্তিক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে আন্দোলনের আমেলা ও শূরা সদস্যগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণের রিপোর্ট নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার সালথা, ফরিদপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সালথা থানাধীন সালথা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার চাঁদপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন আল-ইনছাফ একাডেমীতে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি অলিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদুল্লাহ ও দফতর সম্পাদক হাফেয আশিকুয্যামান।

২০শে সেপ্টেম্বর রবিবার লক্ষ্মীপুর : অদ্য মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পূর্ব বাঞ্ছারামপুর তরীকায়ে মুহাম্মাদী জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হাফেয আশিকুয্যামান।

২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার ফেনী : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সৈয়দ মুহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কাথোরা, গাযীপুর-দক্ষিণ : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার খাগড়াছড়ি : অদ্য বেলা সাড়ে ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন রসূলপুর সবুজবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন উপলক্ষে এক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর সভাপতি অধ্যাপক জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও শূরা সদস্য হাফেয শেখ সাদী প্রমুখ।

২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাঙ্গামাটি : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন কলেজ গেট আমানতবাগ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ফযলুল বারীর বাস ভবনে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ফযলুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার গোলাকান্দাইল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন গোলাকান্দাইল আল-আমীন ফাউণ্ডেশন জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ. ন. ম সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ ও বর্তমান প্রচার সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিনাজপুর-পশ্চিম : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলা সদরে অবস্থিত রেল স্টেশন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে

কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম ও বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদুর রহমান এবং আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আহসান হাবীব প্রমুখ।

২রা অক্টোবর শুক্রবার রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও : অদ্য বাদ আছর যেলার রাণীশংকৈল থানাধীন শান্তিপুর ইত্তেবায়ে সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আহসান হাবীব। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন।

৩রা অক্টোবর শনিবার কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন কাঠিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ ও বর্তমান প্রচার সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

৩রা অক্টোবর শনিবার পাতুলীপাড়া, টাঙ্গাইল : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদরের পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন' সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ যাকারিয়া। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম।

৪ঠা অক্টোবর রবিবার ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার ত্রিশাল থানা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ

১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার ছোট শলুয়া, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দর্শনা থানাধীন ছোট শলুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ইয়াকূব আলী।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা' শীর্ষক সেমিনার

৫ই অক্টোবর সোমবার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর : অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্মারক ময়দানে 'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সেমিনারে গবেষণাপত্র পাঠ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাবির এম ফিল গবেষক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রাজশাহীর নওদাপাড়া মারকাযের মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, ঢাকা মাদ্রাসাতুল কুরআনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. নাহিদ হাসান ও মিসর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষক আব্দুর রহীম প্রমুখ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

'ইসলামে যুদ্ধনীতি ও সমকালীন বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার

৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে 'ইসলামে যুদ্ধনীতি ও সমকালীন বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক মাসিক গবেষণা সেমিনার-৩ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মারকাযের প্রিন্সিপাল হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আবু নোমান মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান এবং গবেষণা বিভাগের সিনিয়র গবেষণা সহকারী ও মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী সারওয়ার মিছবাহ।

প্রশ্নোত্তর ?

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
(সকাল ৯-টা থেকে ১-টা এবং বিকাল ৪-টা থেকে ৬-টা পর্যন্ত)
লিখিত প্রশ্ন করুন- উক্ত WhatsApp নম্বরে অথবা www.at-tahreek.com/qa

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : জনৈক ব্যক্তি অনেকের টাকা নিয়ে পলাতক। সে একটি সমিতির সদস্য এবং সমিতিতে তার কিছু টাকা জমা আছে। আবার সমিতির কয়েকজন সদস্যও তার কাছে টাকা পায়। তাদের একজন অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাকে টাকা দিয়েছিল। বর্তমানে ঋণদাতার পরিবারে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া পিতা, কোন সদস্যের যামীনে বা কমিটির অনুমতি নিয়ে তার জমাকৃত টাকা থেকে পাওনা পরিশোধ করতে পারবে কি?

-ছাদিকুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে পাওনাদারেরা তাদের প্রাপ্য সম্পদ আনুপাতিকহারে নিয়ে নিতে পারবে। কেউ মওকূফ করে দিলে সেটা তার জন্য ছওয়াবের কাজ হবে। উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, আপনি আমাদেরকে কোন অভিযানে পাঠান। আমরা এমন কোন সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমান হিসাবে গ্রহণ করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তিনি আমাদের বললেন, তোমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করবে, তারা যদি মেহমানের উপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে, তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহ'লে মেহমানের জন্য তাদের ওপর যে পরিমাণ আপ্যায়ন করা কর্তব্য, তোমরা তাদের কাছ থেকে ততটুকু গ্রহণ করে নেবে *(বুখারী হা/৬১৩৭; মুসলিম হা/১৭২৭; মিশকাত হা/৪২৪৫)*। এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইরাক্বী ও ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছ দ্বারা নিজের প্রাপ্য হক আদায় করার মাসআলার দলীল গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, কোন ব্যক্তির যদি অন্যের কাছে কোন হক পাওনা থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করে, তাহ'লে পাওনাদার তার সম্পদ থেকে যতটুকু নিজের হক বাবদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, ততটুকু গ্রহণ করতে পারবে। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন; 'মযলূম ব্যক্তি যখন যালিমের সম্পদ পায়, তখন তার পক্ষ থেকে সমপরিমাণ প্রতিকার গ্রহণ করা *(ত্বারহুত তাছরীব ৮/২২৬; মা'আলিমুস সুনান ৩/৯৯)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং আমাদের পূর্ববর্তী যে সকল বিদ্বানের বক্তব্য সংরক্ষিত হয়েছে, তাঁদের ইজমা এটাই প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তির অন্য কারো নিকট কোন প্রাপ্য হক থাকলে এবং সে ব্যক্তি যদি তা প্রদান না করে, তাহ'লে পাওনাদার তার নিকট থেকে নিজের প্রাপ্য হক গ্রহণ করতে পারবে *(কিতাবুল উম্ম ৬/২৬৭-২৬৮)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : ওয়ায মাহফিলে অনেক বক্তার মুখে শোনা যায় যে, ওমর (রাঃ) বিচারের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অবমাননাকর আচরণকারী এক মুসলিমকে হত্যা করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার কোন নির্ভরযোগ্য দলীল আছে কি?

-মুছত্বফা মনোয়ার, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : প্রথমত ঘটনাটি ছহীহ নয়। বর্ণিত হয়েছে যে, এক মুনাফিক ব্যক্তি এক ইহূদীর সঙ্গে বিবাদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহূদীর পক্ষে ফায়ছালা দিলেন। কিন্তু মুনাফিক ব্যক্তি তাঁর ফায়ছালায় সন্তুষ্ট হ'ল না। সে বলল, চল আমরা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের কাছে বিচার নিয়ে যাই। তারা ওমর (রাঃ)-এর কাছে এলে ইহূদী বলল, আমি ও এই ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলাম। তিনি আমার পক্ষে ফায়ছালা করেছেন; কিন্তু সে তাঁর ফায়ছালায় সন্তুষ্ট হয়নি এবং আপনার কাছে বিচার চাচ্ছে। ওমর (রাঃ) মুনাফিককে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ঠিক? সে বলল, হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে তরবারী নিয়ে বের হ'লেন এবং সেই মুনাফিককে তরবারী দিয়ে হত্যা করলেন' *(ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর ১৮/২৬৯)*। বর্ণনাটি তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে সূরা নূরের ৪৭ আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে ব্যবহার করা হ'লেও এটা ছহীহ নয়। বরং ওছায়মীন বলেন, ঘটনাটি দুর্বল শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে *(আল-কওলুল মুফীদ ২/১৭৯)*। শায়েখ আব্দুল আযীয আর-রাজিহী বলেন, এই ঘটনাটি প্রমাণিত নয়, এর সনদ মুনক্বাতি' (ছিন্নসূত্র)। কারণ শা'বী ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি' *(তায়সীরুল হামীদ.. ১/১২৮)*। দ্বিতীয়ত কোন ছাহাবী নিজের হাতে আইন তুলে নেননি। বরং তারা যা কিছু করেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে করেছেন বা রাসূল (ছাঃ) ঘটনা শুনার পর সেটা ন্যায়সঙ্গত হ'লে তার অনুমোদন দিয়েছেন *(বুখারী হা/৪১১৯; আবুদাঊদ হা/৩৩৪)*।

(৩/৪৩) : অনেকে তামাকজাত দ্রব্য যেমন বিড়ি, সিগারেট, গুল, জর্দা ইত্যাদি খায়। নিষেধ করলে বলে এগুলো মাকরূহ। সঠিক বক্তব্য জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ রাইদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : তামাকজাত দ্রব্য পুরোপুরি হারাম; স্রেফ মাকরূহ নয়। কারণ এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর এবং মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ হারাম করেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। তিনি আরও বলেন, 'আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্থ হয়ো না এবং ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ইরওয়া হা/৮৯৬)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, শরী'আতের দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, ধূমপান করা হারাম। কারণ এতে অপবিত্রতা ও বহুবিধ ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৯৮, ১২/১২৪, ২৩/৪৪)*। শায়েখ ওছায়মীন বলেন, হারাম হওয়ার সাধারণ প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে ধূমপান হারাম' *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫৪/১১১)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : আমার স্ত্রী বার্ধক্যজনিত কারণে খুবই অসুস্থ। সে গত রামাযানে ছিয়াম পালন করতে পারেনি। এখনো ক্বাযা আদায় করার মত তার শারীরিক অবস্থা নেই। এক্ষণে করণীয় কি?

-গিয়াছুদ্দীন, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

উত্তর : ক্বাযা আদায়ে সক্ষম না হ'লে ফিদইয়া প্রদান করবে। যদি তার অসুস্থতা সাময়িক হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা থাকে, তাহ'লে বর্তমানে ক্বাযা আদায় করা যরূরী নয়। সুস্থ হওয়ার পর রামাযানে ছুটে যাওয়া দিনগুলোর ক্বাযা আদায় করবেন। অসুস্থতার কারণে পরবর্তী রামাযান চলে এলেও, যদি তিনি বাস্তবেই ক্বাযা আদায়ের সুযোগ না পেয়ে থাকেন, তাহ'লে তাঁর ওপর অতিরিক্ত ফিদইয়া আবশ্যক হবে না। সুস্থ হ'লে শুধু ক্বাযা করবেন। আর যদি বিশ্বস্ত চিকিৎসক মনে করেন যে, তাঁর রোগটি দীর্ঘস্থায়ী এবং সুস্থ হয়ে ছিয়াম পালনের সক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা নেই, তাহ'লে তিনি প্রতিটি ছুটে যাওয়া দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে অর্ধ ছা' খাদ্য প্রদান করবেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৭৮, ১৯/১১০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৬/২২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/১১৭)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : আমার বাসায় কমল দাস নামে এক হিন্দু ভাড়া থাকতেন। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিব। কিন্তু অলসতা করে একমাস বিলম্ব হয়ে যায়। এরই মধ্যে তিনি দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষণে সময়মত ইসলামের দাওয়াত দিতে না পারায় কি আমাকে জবাবদিহি করতে হবে?

-সাঈদুর রহমান, কমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তর : অমুসলিমদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা মূলত ফরযে কিফায়াহ। তবে কোন অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হ'লে এবং অন্য কেউ তা না দিলে, তা সেই ব্যক্তির জন্য ফরযে 'আয়েন সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা আবশ্যক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া সাধারণ বিচারে ফরযে কিফায়াহ। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করা তখন ফরয হয়ে যায়, যখন অন্য কেউ তা পালন না করে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/১৬৬)*। অতএব সৎনিয়তের কারণে ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অলসতাবশত বিলম্ব করা একটি অনুচিত কাজ ও ত্রুটি হয়েছে। এজন্য আল্লাহ্র দরবারে তওবা ও ইস্তিগফার করা এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্তব্য। মনে রাখা আবশ্যক যে, দাওয়াতের ফযীলত অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়াত পায়, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে' *(বুখারী হা/৩৭০১; মুসলিম হা/২৪০৬)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : আমাদের এলাকায় একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা রয়েছে। এলাকার মানুষ প্রায়ই মাদ্রাসায় ছাগল ছাদাক্বা করে। ছাগলের গোশত ছাত্র-শিক্ষকরা খেয়ে থাকেন। উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে এ গোশত খাওয়া আমার জন্য হালাল হবে কি?

-শাহারুল হক, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে প্রদত্ত ছাগলের গোশত ছাত্র-শিক্ষক সবাই খেতে পারবে। কারণ এটি যাকাত নয়, বরং নফল ছাদাক্বা। আর নফল ছাদাক্বা ধনী-গরীব সবাই খেতে পারবে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নফল ছাদাক্বা ধনীদের জন্য জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২৩৬)*। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, ধনীদের জন্য ফরয ছাদাক্বা গ্রহণ করা হারাম। তবে নফল বা সাধারণ ছাদাক্বা জায়েয *(ইবনু কুদামা, মুগনী ২/২৭৬)*। এক্ষণে মাদ্রাসায় সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে কিছু প্রদান করা হ'লে তা শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীরা খেতে পারে। আর যাকাত বা মানত থেকে দান করা হ'লে কেবল হকদাররাই খেতে পারবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৪/৩০৬; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯-১০/০২)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : জনৈক সন্তান তার পিতার পায়ের নলায় রড দিয়ে আঘাত করে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয় এবং পায়ের নলা ফেটে যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পিতা মারা যান। এক্ষণে উক্ত সন্তান কি পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অংশ পাবে?

-ইয়াসমীন সুলতানা, আলাদীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যদি প্রমাণিত হয় যে, সন্তান ইচ্ছাকৃতভাবে এমন আঘাত করেছে যার কারণে পিতার মৃত্যু হয়েছে, তাহ'লে সে তার পিতার হত্যাকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার পাবে না' *(বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৫৪২২)*। আর এই মহাপাপের জন্য সন্তানকে আমৃত্যু তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে, নতুবা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। কারণ পিতা-মাতাকে কষ্টদায়ক শব্দ উল্লেখ করতে যেখানে নিষিদ্ধ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩)*, সেখানে তাদের গায়ে হাত তোলা বা আঘাত করা এক মারাত্মক ও ভয়াবহ মহাপাপ।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : আমি একটি মসজিদের ইমাম। জুম'আর দিনে বাড়ী থেকে ওযূ করে বের হই। একদিন রাস্তায় ওযূ ভেঙ্গে যায়। মসজিদে গিয়ে ওযূর কথা ভুলে যাই। এ অবস্থায় খুৎবা প্রদান করি এবং ছালাতে ইমামতি করি। আছর ছালাত আদায় করার সময় বিষয়টি মনে পড়ে। এক্ষণে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বোর্ড বাজার, গাযীপুর।

উত্তর : ইমামের যখনই স্মরণ হবে ওযূ করে যোহরের চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে। কারণ ওযূ ছাড়া ছালাত হয়নি। তবে মুছাল্লীদের ছালাত হয়ে গেছে। কারণ তারা পবিত্র এবং ইমামের ওযূবিহীন থাকার বিষয়টি তারা জানতেন না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৬৬)*। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, কোন ইমাম যদি মুছল্লীদের নিয়ে এমন অবস্থায় ছালাত আদায় করেন যে, তিনি ওযূবিহীন অথবা নাপাক ছিলেন, অথচ নিজের অপবিত্রতার বিষয়টি তিনি জানতেন না তাহ'লে মুছল্লীদের ছালাত ছহীহ হবে; কিন্তু ইমামের ছালাত বাতিল হবে। ওমর (রাঃ) একবার লোকদের নিয়ে ফজরের

ছালাত আদায় করলেন। পরে তাঁর কাপড়ে স্বপ্নদোষের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন তিনি পুনরায় ছালাত আদায় করলেন, কিন্তু মুছল্লীদের পুনরায় ছালাত আদায় করতে বলেননি' *(দারাকুৎনী হা/১৩৭২; ইরওয়া হা/৫৩৩)*। ওছমান (রাঃ) লোকদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। পরে সকাল হয়ে সূর্য উপরে ওঠার পর তিনি তাঁর মধ্যে নাপাকীর চিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন তিনি পুনরায় ছালাত আদায় করলেন কিন্তু মুছল্লীদের পুনরায় ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন না *(আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্ত্বা ১/১৮২)*। আলী (রাঃ) বলেন, 'কোন নাপাক ব্যক্তি যদি লোকদের নিয়ে ছালাত পূর্ণ করে ফেলে, তাহ'লে আমি তাকে গোসল করে পুনরায় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেব। কিন্তু তাদের পুনরায় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেব না' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪৫৭৫)*। আর ইবনু ওমর (রাঃ) লোকদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করার পর স্মরণ করলেন যে, তিনি ওযূ ছাড়া ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি নিজে ছালাত পুনরায় আদায় করলেন, কিন্তু মুছল্লীদের পুনরায় আদায় করতে বলেননি *(ইবনু কুদামা, মুগনী, ১/৪১৯)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : চাঁদের মধ্যে তারা দেখা গেলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় মর্মে প্রচলিত কথাটা কি সঠিক?

-ইমদাদুল হক, বড়গাছী, রাজশাহী।

উত্তর : কথাটি সঠিক নয়; বরং লোকমুখে প্রচলিত বচন। যেমন বলা হয় 'চাঁদের সভার মধ্যে তারা, বর্ষে পানি মূষলধারা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হ'লে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে যে, তাঁর মৃত্যুর কারণেই এমনটি হয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, 'নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে এগুলোতে গ্রহণ লাগে না' *(বুখারী হা/১০৪৩; মুসলিম হা/৯০১; মিশকাত হা/১৪৮২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নক্ষত্রের মাধ্যমে ভাগ্য গণনার বিদ্যা শিখল, সে জাদুবিদ্যার একটি শাখা শিখল। এ বিদ্যা যত বেশী শিখবে, তার অর্জিত জাদুবিদ্যার অংশও তত বাড়বে' *(আবুদাঊদ হা/৩৯০৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৫১)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : ছালাতে একটি না কি দু'টি সিজদা করেছি, এ বিষয়ে সন্দেহ হ'লে করণীয় কি?

-রাসেল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : জমহূর বিদ্বানের মতে, প্রতি রাক'আতে দু'টি সিজদাই ছালাতের রুকন। অতএব কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সিজদা ছেড়ে দিলে তার ছালাত বাতিল হবে। আর ভুলে একটি সিজদা বাদ পড়লে শুধু সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে না; বাদ পড়া সিজদা বা তার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় রাক'আত আদায় করতে হবে। এক্ষণে যদি বৈঠকের মধ্যেই সন্দেহ হয় যে একটি সিজদা করেছেন, নাকি দু'টি, তাহ'লে যেটি কম সেটি ধরে আরেকটি সিজদা করতে হবে। এরপর ছালাতের শেষে সহো সিজদা দিতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩০)*। কিন্তু সিজদা বাদ পড়ার বিষয়টি যদি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর মনে হয় তাহ'লে উক্ত রাক'আত বাতিল মনে করে অতিরিক্ত এক রাক'আত ছালাত আদায় করে সহো সিজদা দিবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩৮৪)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ ছালাতের মধ্যে সন্দেহে পড়ে গেলে সে তিন রাক'আত পড়েছে, নাকি চার রাক'আত, তা নিশ্চিতভাবে মনে করতে না পারলে সে যে সংখ্যাটি নিশ্চিতভাবে পড়েছে, সেটি ধরে ছালাত পূর্ণ করবে। এরপর সালাম ফেরানোর আগে দু'টি সহো সিজদা করবে' *(মুসলিম হা/৫৭১; মিশকাত হা/১০১১৫)*। উল্লেখ্য যে, ছালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সিজদা নিয়ে কেবল সন্দেহ হ'লে সেটা ধর্তব্য হবে না। তবে একটি সিজদা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হ'লে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১১/৫১) : ক্বিয়ামতের দিন সূর্য থাকবে না। আল্লাহ্র নূরে হাশরের ময়দান আলোকিত হবে। একসময় আল্লাহ তাঁর নূর নিভিয়ে দেবেন। তখন কেবল মুমিনেরা আলো পাবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সানি, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ক্বিয়ামতের শুরুতে সূর্য থাকবে না। এরপর হাশরের ময়দানে সূর্যকে আবার নিয়ে আসা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির এত কাছে নিয়ে আসা হবে যে, তা তাদের থেকে এক মাইল দূরত্বে থাকবে' *(মুসলিম হা/২৮৬৪; মিশকাত হা/৫০৪০)*। এরপর বিচার পরবর্তীকালে সূর্যের আলো থাকবে না বলে ধারণা করা যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা ঈমানদারগণকে বলবে, তোমরা একটু থামো, তোমাদের থেকে কিছু আলো নিয়ে নিই' *(হাদীদ ৫৭/১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাদের প্রত্যেককে সে মুনাফিক হোক কিংবা মুমিন, একটি নূর দেওয়া হবে। অতঃপর তারা সেই নূরের অনুসরণ করবে। আর জাহান্নামের সেতুর ওপর থাকবে লোহার বাঁকানো আংটা ও কাঁটা, যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে ফেলবে। এরপর মুনাফিকদের নূর নিভিয়ে দেওয়া হবে। তারপর মুমিনরা নাজাত লাভ করবে' *(মুসলিম হা/১৯১)*। যাহ্হাক বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এমন কেউ থাকবে না, যাকে কোন নূর দেওয়া হবে না। অতঃপর তারা যখন পুলছিরাতের কাছে পৌঁছবে, তখন মুনাফিকদের নূর নিভিয়ে দেওয়া হবে। তখন মুমিনরা তা দেখে আশঙ্কা করবে যে, মুনাফিকদের নূর যেভাবে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেভাবে যেন তাদের নূরও নিভিয়ে না দেওয়া হয়। তাই তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর, দারু ইবনুল জাওযী ৭/১৭৬)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : কোন পিতা সন্তানের প্রতি যুলুম করার পর সন্তানের বিরুদ্ধে বদদো'আ করলে সেই বদদো'আ কবুল হবে কি?

-আব্দুর রহীম, যশোর।

উত্তর : কবুল হ'তে পারে। কারণ সন্তানের জন্য পিতার দো'আ কবুল হয় *(তিরমিযী হা/১৯০৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৫৫)*। তবে পিতার জন্য সন্তানের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদদো'আ করো না, নিজ সন্তানদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে

বদদো'আ করো না। যাতে তোমরা এমন এক সময়ে না পৌঁছে যাও, যে সময় দো'আ করা হ'লে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয়' *(মুসলিম হা/৩০০৯, মিশকাত হা/২২২৯)*। অর্থাৎ এর ফলে বদদো'আ লেগে যেতে পারে। উপরন্তু কারো জন্য জাহান্নাম কামনা করা ও ধ্বংস কামনা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যদিকে সন্তানের জন্য আবশ্যক হবে যেকোন মূল্যে পিতার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ আল্লাহ্র পরে পিতা-মাতা সন্তানের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার *(লোকমান ৩১/১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; ছহীহাহ হা/৫১৬; মিশকাত হা/৪৯২৭)*। তবে শিরক-বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কোন কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫)*। এরূপ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে এবং তারা বদ-দো'আ করলে তাদের দো'আ কবুল হবে না ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/৬৪০১; ফাৎহুল বারী ১১/২০০)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : কোন ব্যক্তি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ব্যবহার বা গেম খেলে, তবে হারাম কনটেন্ট দেখে না। এভাবে সময় অপচয় করার কারণে সে গোনাহগার হবে কি?

-মু'আয, ময়মনসিংহ।

উত্তর : অনর্থক সময় অপচয়ের জন্য সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা ও ক্রীড়ায় পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদের ভুলে যাব, যেমন তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল *(আ'রাফ ৭/৫১)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা দুই কদমও সরবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (১) তার জীবন সম্পর্কে। তা সে কোন কাজে ব্যয় করেছে। (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে। তা সে কিসে জীর্ণ করেছে। (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে। তা সে কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং (৪) তা সে কিসে ব্যয় করেছে। (৫) সে তার ইল্ম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে' *(তিরমিযী হা/২৪১৭,সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৯১৫৭)*। তিনি বলেন, 'একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক বিষয় পরিহার করা' *(তিরমিযী হা/২৩১৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, সময় তরবারির মতো, তুমি যদি তাকে কাজে লাগিয়ে অতিক্রম না করো, তবে সময়ই তোমাকে গ্রাস করবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী..পৃ. ১৫৬)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সময় নষ্ট করলে তাঁর সব কল্যাণই হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ সব কল্যাণই সময় থেকে অর্জিত হয়। আর সময় একবার নষ্ট করলে তা আর কখনো ফিরে পাওয়া যায় না' *(আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫৬)*। ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন একটি দিন এমনভাবে অতিবাহিত করল যেদিন সে কোন প্রাপ্য অধিকার আদায় করল না, কোন ফরয দায়িত্ব পালন করল না, কোন মহৎ কীর্তি প্রতিষ্ঠা করল না, কোন প্রশংসনীয় কাজ করল না, কোন কল্যাণকর কাজের ভিত্তি স্থাপন করল না এবং কোন জ্ঞান অর্জন করল না, সে মূলত তার দিনটির প্রতি অবিচার করল এবং নিজের উপর যুলুম করল *(আদাবুদ্দুনইয়া ওয়াদ দ্বীন পৃ. ৫৫)*। উল্লেখ্য যে, ফেসবুক বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া দেখা সরাসরি গোনাহের কাজ নয়, যদি তাতে অশ্লীল কিছু দেখা না হয়। কিন্তু অনর্থক বিনোদনে সময় অপচয় করার জন্য গোনাহ হবে।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : দান সম্পদ কমায় না বরং বৃদ্ধি করে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানতে চাই?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ছাদাক্বা করার কারণে বান্দার প্রকৃত সম্পদ ও কল্যাণ কমে যায় না। আল্লাহ তাতে বরকত দেন এবং আখেরাতে এর প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ ব্যাপারে আলেমগণ দু'টি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন- **প্রথমত** এর অর্থ হ'ল ছাদাক্বা করার কারণে সম্পদে বরকত দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ক্ষতি থেকে তা রক্ষা করা হয়। ফলে বাহ্যিকভাবে সম্পদ যতটুকু কমে, গোপন বরকতের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। এটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রচলিত কার্য-কারণের মাধ্যমেও উপলব্ধি করা যায়। **দ্বিতীয়ত** বাহ্যিক হিসাবে সম্পদ কমে গেলেও, ছাদাক্বার বিনিময়ে যে ছওয়াব নির্ধারিত রয়েছে, তার মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়; বরং তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় *(শরহ মুসলিম ৬/১৬৯)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ছাদাক্বাকারী ব্যক্তির সম্পদ বাহ্যিক হিসাবে কমে যায়। কিন্তু আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং ছাদাক্বাসমূহকে বৃদ্ধি করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬; আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৬/১৬৯)*। তাই ছাদাক্বা সম্পদ হ্রাস করে না; বরং তা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুনিয়াতে বরকত এবং আখেরাতের ছওয়াব অর্জনের মাধ্যম। বস্তুত ছাদাক্বা যেমন সমাজে সমৃদ্ধি আনে, তেমনি আখেরাতে ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। শিল্পপতি শিল্পের যাকাত দিলে গরীবরা সে যাকাত দিয়ে শিল্পের উৎপাদন খরীদ করে। ফলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি হয়। অন্যদিকে দারিদ্র বিমোচন হয়। এভাবে সমাজে সমৃদ্ধি লাভ হয়। এভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী সত্য হয়।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : অনলাইনে কোন পণ্য বিক্রির সময় সেরা ও ১০০% কার্যকর, গ্যারান্টি ইত্যাদি দাবী করা যাবে কি?

-রাঈদ আব্দুল্লাহ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যদি কোন পণ্যের কার্যকারিতা বাস্তবিকই ১০০% নিশ্চিত হয় বা বাজারের সেরা হয় তাহ'লে বলা যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হ'লে ১০০% কার্যকর বলা জায়েয হবে না। কারণ এটি ক্রেতাকে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ও পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে ভালো পণ্যের সাথে গ্যারান্টিও দিতে পারে। তবে কোন সন্দেহ থাকলে বা পণ্যের মান অজ্ঞাত থাকলে এরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ১২৪; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৮/২৫৬-২৫৭)*। নবী কমীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যদি সত্য বলে

এবং (পণ্যের বিষয়গুলো) স্পষ্ট করে, তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হয়। আর তারা যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত তুলে নেওয়া হয়' *(বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। আমার আয়ের উৎস টিউশনি করা। আমি একটি মেয়েকে পসন্দ করি। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বিয়ের আলোচনা হ'লেও আমার পরিবার এখন বিয়েতে রাযী নয়। তারা আগে চাকুরী করে প্রতিষ্ঠিত হ'তে বলছে। আমি হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচতে হালালভাবে বিয়ে করতে চাই। এমতাবস্থায় পিতা-মাতাকে না জানিয়ে বিয়ে করলে কি গোনাহ হবে?

-ফারূক, ঢাকা।

উত্তর : ছেলে ও মেয়ে উভয়ের উচিৎ অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা। পাত্রী দ্বীনদার হ'লে পিতার উচিৎ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করা। পিতা-মাতা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের উপযুক্ত সময়ে বিয়ে না দিলে এবং তারা গোনাহে লিপ্ত হ'লে পিতা-মাতাও গোনাহের ভাগীদার হবেন। এক্ষণে যদি মেয়ে দ্বীনদার হওয়া সত্ত্বেও ছেলের পিতা কোনভাবেই বিয়ের ব্যবস্থা না করেন, তাহ'লে মেয়ের পিতার সম্মতিক্রমে ছেলে উক্ত মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। বরং ছেলের কাছে যদি বিয়ের খরচ বহনের মতো কোন অর্থ না থাকে, তাহ'লে পিতার দায়িত্ব হ'ল নিজের সম্পদ থেকে তার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করা *(ওছায়মীন, ফাতাওয়াল মারাতিল মুসলিমাহ ২/৭০৮)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : আমার পিতা প্রায় ২০ বছর আগে ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে আমার চাচার ২ শতক জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। বর্তমানে ঐ পরিমাণ জমি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো কোন জমি তার নেই। এমতাবস্থায় ২ শতক জমির পরিবর্তে টাকা দিলে কি দায় শোধ হবে? যদি হয় তাহ'লে তৎকালীন নাকি বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী টাকা দিতে হবে?

-ছাকিব সরকার, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : চাচার বর্তমান ২ শতক জমির ন্যায্য বাজারমূল্য নির্ধারণ করে পারস্পরিক সম্মতিতে টাকা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে স্পষ্টভাবে দায়মুক্তি নেয়া কর্তব্য *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৫/২০৯)*। কারণ যা বিক্রয় করা হয়েছিল তা অন্যের সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মানুষের প্রাপ্য জিনিস কম দিও না' *(আ'রাফ ৭/৮৫)*। এক্ষণে চাচা অল্পে খুশী হ'লে বা মাফ করে দিলে দায়মুক্তি পাবে *(ইবনু মাজাহ হা/২১৮৫; ছহীহুল জামে' হা/২৩২৩)*। শায়েখ মানছুর আল-বুহূতী (রহঃ) বলেন, 'কেউ যদি অন্য ব্যক্তির কোন মূল্যবান ও হালাল সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নষ্ট করে, তাহ'লে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সে ঐ ব্যক্তিকে তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই তার ওপর এর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়েছে' *(কাশশাফুল ক্বেনা', ৪/১১৭)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। এখন স্ত্রী যদি বৃদ্ধা হয় তার জন্যও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে? নাকি বয়োবৃদ্ধা হওয়ার কারণে ছাড় আছে?

-আব্দুস সালাম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী বৃদ্ধা বা বয়স্কা হ'লেও তাকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। আর গর্ভবতী হ'লে তাকে বাচ্চা জন্মদান পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে *(তালাক ৬৫/৪)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় রাখবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*। এ বিধান যুবতী-বৃদ্ধা সবার জন্যই প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন নারীর জন্য কোন মৃত ব্যক্তির ওপর তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে' *(বুখারী হা/১২৮০; মুসলিম হা/১৪৮৬)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কোন স্বাধীন মুসলিম নারী গর্ভবতী না হ'লে তার স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর তার ইদ্দতের মেয়াদ চার মাস দশ দিন। স্বামী তার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে থাকুক বা না থাকুক উভয় ক্ষেত্রেই একই বিধান। আর নারী প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধা হোক কিংবা এমন অপ্রাপ্তবয়স্কা হোক, যে এখনও বালেগা হয়নি, সবার ক্ষেত্রেই একই বিধান প্রযোজ্য' *(মুগনী ৮/১১৫)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : সির্রি ছালাতে তথা যোহর ও আছরের ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর মুছল্লীরা কি চুপ করে থাকবে? না অন্য সূরা পাঠ করবে?

-আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সির্রী ছালাতে তথা যোহর এবং আছরে প্রথম দুই দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করবে। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে নীরবে পাঠ করবেন *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১২/৩২১)*। আর শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অতিরিক্ত ক্বিরাআত পাঠের বিষয়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআতের পরিমাণের বিবরণ এসেছে *(মুসলিম, হা/৪৫২)*। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) এই বর্ণনার ভিত্তিতে শেষ দুই রাক'আতেও ফাতিহার পর অতিরিক্ত ক্বিরাআত পাঠ করাকে উত্তম বলেছেন *(আল-লিক্বাউশ শাহরী, ২৪/৭১)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : বিবাহে আমি নগদ মোহর পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু মেয়ের পিতা নগদ মোহরের পরিমাণ কম হওয়ায় বিয়েতে রাযী হচ্ছেন না। তিনি বাকী হ'লেও মোহরের পরিমাণ বেশী করতে আগ্রহী। যা আমার পক্ষে পরিশোধ করা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় মোহরের পরিমাণ বেশী করে পরে আমি যদি আমার স্ত্রীকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরের টাকা দিয়ে, বাকী টাকা মাফ করে নেই এবং স্ত্রী যদি আমাকে মাফ করে দেয় তাহ'লে কি এটি জায়েয হবে?

-সেলিম আলী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মোহরানা পরিশোধ না করার পরিকল্পনা করে মোহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন নারীকে কম বা বেশী মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে করল, অথচ সে তার মোহর পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে না.... তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন একজন যেনাকার হিসাবে উপস্থিত হবে' *(ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৭)*। তবে সাধারণভাবে

স্ত্রী যদি বিয়ের পর নিজের পূর্ণ ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিতে মোহরের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহ'লে তা জায়েয এবং স্বামীর ওপর থেকে সেই অংশের দায়মুক্তি হবে। আল্লাহ বলেন, 'তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোহরের কোন অংশ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করো' *(নিসা ৪/৪)*। রাসূল মোহরের পরিমাণ সহজ করতে উৎসাহিত করেছেন *(ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৯)*। অতএব ইচ্ছা করে নয় বরং অজ্ঞতাবসে অতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণ করা হ'লে এবং পরবর্তীতে স্ত্রী তা স্বামীকে ছাড় দিলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২১/৬১) : ব্যাংকে চাকুরী করা যদি সূদী কার্যক্রমে সহযোগিতার কারণে হারাম হয়, তাহ'লে একই সূদভিত্তিক ব্যাংকে জেনেশুনে টাকা রাখা এবং বিভিন্ন লেনদেন ও সেবা গ্রহণ করা হারাম নয় কেন? বিশেষত, আমানতকারীর টাকা ব্যাংক সূদী কাজে ব্যবহার করলে তা কি সূদী কার্যক্রমে পরোক্ষ সহযোগিতা হিসাবে গণ্য হবে না? ব্যাংক ব্যবহার না করেও বিকল্পভাবে চলা সম্ভব হ'লে শুধু প্রচলিত ব্যবস্থা ও সুবিধার কারণে তা বৈধ হওয়ার শারঈ ভিত্তি কি?

-মারূফ হাসান, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হারাম তা সূদসহ হোক কিংবা সূদ ছাড়া। কারণ ব্যাংক এই অর্থ গ্রহণ করে সূদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে। তবে আলেমগণ একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে এর ব্যতিক্রম করেছেন। তা হ'ল কোন ব্যক্তি যদি নিজের সম্পদ নিয়ে আশঙ্কা করেন এবং তার সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করার মতো অন্য কোন নিরাপদ স্থান না পান, তাহ'লে বিশেষ প্রয়োজনে সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জায়েয হবে। কারণ শরী'আতের একটি মূলনীতি হ'ল 'চরম প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কে সাময়িকভাবে বৈধ করে'। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'সূদবিহীনভাবে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই, যদি এর প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে যদি ব্যাংক ছাড়া অন্য কোথাও টাকা নিরাপদে জমা রাখার সুযোগ থাকে, তাহ'লে তা অধিক সতর্কতাপূর্ণ ও উত্তম' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৪১৩)*। এক্ষণে ব্যাংকে চাকুরী এবং প্রয়োজনের কারণে সূদবিহীন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকে একই হুকুমে ফেলা যাবে না। আবার ব্যাংকিং সেবা প্রয়োজনীয় হ'লেই সূদী লেনদেন বৈধ হয়ে যায় এটিও সঠিক নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজ, অ্যাকাউন্টের ধরন, সূদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং বিকল্প বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : বিভিন্ন কারণে বিয়ের ৭ বছর পরও আমি স্বামীর সঙ্গে পিতার বাড়ীতে থাকি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত নেই। চাচা-শ্বশুর ও চাচাতো ভাইদের সঙ্গে স্বামীর কোন বিরোধ নেই। তবে সেখানে যাওয়া হয় না। স্বামী মাঝে মাঝে দু'একজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার তেমন কথা হয় না এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সবাইকে ভালোভাবে চিনি না। এ অবস্থায় কি আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসাবে গণ্য হব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রংপুর।

উত্তর : স্বামীর আত্মীয়রা স্ত্রীর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় নয়। সেজন্য স্ত্রী তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা না করার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসাবে গণ্য হবে না। ইসলামে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক, তা মূলত নিজের পিতৃ ও মাতৃকূলের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বামীর আত্মীয়রা স্ত্রীর জন্য রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় নয় *(নববী, শরহু মুসলিম ১৬/১১৩; ছান'আনী, সুবুলুস সালাম)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রওযার পাশে যে স্থানটি খালি রয়েছে, সেখানে ঈসা (আঃ)-কে দাফন করা হবে, উক্ত কথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-সাইফুল ইসলাম আযাদ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুজরায় অবশিষ্ট খালি স্থানে ঈসা (আঃ)-কে দাফন করা হবে মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া গেলেও তা ছহীহ নয়; বরং এর সনদ যঈফ। তাই বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় *(আলবানী, যঈফাহ হা/৬৫৬২, সনদ মুনকার)*। আব্দুল্লাহ বিন সালাম থেকে কিছু মওকূফ বর্ণনাও পাওয়া যায়, যেগুলি যঈফ *(যঈফাহ ৬৯৬২)*। অতএব ঈসা (আঃ)-এর দাফন কোন স্থানে হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : মযী লেগে গেলে তা পুরোপুরি ধৌত করতে হবে কি? কি পরিমাণে লেগে থাকলে ঐ কাপড়ে ছালাত শুদ্ধ হবে?

-তাহাজুল ইসলাম, দিনাজপুর।

উত্তর : কাপড়ের যে অংশে মযী লেগে গেছে কেবল সে অংশ ধৌত করলেই বা পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে *(তোহফাতুল আহওয়াযী ১/৩৩৭)*। সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) বলেন, 'মযীর কারণে আমি খুব কষ্ট ও সমস্যায় পড়তাম। তাই আমি বারবার গোসল করতাম। বিষয়টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এক্ষেত্রে তোমার জন্য ওযূ করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাপড়ে যে মযী লাগে, তার কি করব? তিনি বললেন, তোমার জন্য এক অঞ্জলি পানি নেওয়া এবং তোমার কাপড়ের যে স্থানে মযী লেগেছে বলে তুমি মনে করো, সেখানে সেই পানি ছিটিয়ে দেওয়া যথেষ্ট' *(তিরমিযী হা/১১৫; আহমাদ হা/১৬০১৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : শুক্রবারে ফজরের ফরয ও সুন্নাত উভয় ছালাতে কি হাদীছে বর্ণিত বিশেষ সূরা তেলাওয়াত করতে হবে?

-আব্দুল মান্নান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শুক্রবার ফজরের ফরয ছালাতে রাসূল (ছাঃ) মাঝে মধ্যে সূরা আস-সাজদাহ ও দাহর তেলাওয়াত করতেন *(মুসলিম হা/৮৮০; মিশকাত হা/৮৩৮)*। আবার কখনো তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা মুনাফিকুন পড়েছেন *(মুসলিম হা/৮৭৭; মিশকাত হা/৮৩৯)*। তবে ফজরের সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ছোট সূরা পাঠের নির্দেশনা দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের দুই রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করেছেন *(মুসলিম হা/৭২৬; মিশকাত হা/৮৪২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিশবার লক্ষ্য করেছি তিনি মাগরিবের পরের দুই রাক'আত এবং

ফজরের পূর্বের দুই রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন *(নাসাঈ হা/৯৯২; ছহীহাহ হা/৩৩২৮)*। এর হিকমত সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এই দুই সূরা পাঠ করার হিকমত হ'ল এ দু'টিতে তাওহীদের তিনটি প্রকারই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সূরা ইখলাছ-এ তাওহীদুর রুবূবিইয়াহ এবং আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা একক ইলাহ। একই সঙ্গে তাঁর সন্তান, পিতা এবং কোন সমকক্ষ বা সাদৃশ্য থাকার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। আর তিনি ছামাদ যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতার সকল গুণ একত্রিত হয়েছে। আর সূরা কাফিরূনে তাওহীদুল ইবাদাহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করবে এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের সুন্নাতের মাধ্যমে দিনের সূচনা করতেন এই দুই সূরা দিয়ে এবং মাগরিবের সুন্নাতের মাধ্যমে দিন শেষ করতেন এই দুই সূরা দিয়ে। আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিতর ছালাতেও এই দুই সূরা পাঠ করতেন। ফলে এগুলো যেমন দিনের আমলের সূচনা, তেমনি রাতের আমলেরও সমাপ্তি হিসাবে থাকত' *(বাদাইউল ফাওয়াইদ ১/১৪৫-১৪৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : নারী-পুরুষ একাকী ফরয ছালাত আদায়ের সময় ইক্বামত দেওয়া যরূরী কি?

-কামারুয্যামান, রাজশাহী।

উত্তর : নারী-পুরুষ একাকী ফরয ছালাত আদায়কালেও ইক্বামত দেওয়া সুন্নাত। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামত সুন্নাত। এগুলো ওয়াজিব নয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৬১)*। তবে নারীদের আযান ও ইক্বামত শরী'আতসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধমতে নারীরাও নারীদের পরিবেশে আযান ও ইক্বামত দিতে পারে। তবে না দিলেও ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না বা সুন্নাতের খেলাফ হবে না *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২২; আলবানী, যঈফাহ হা/৮৮০-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত মাঝে কোন তাশাহহুদ ছাড়া একত্রে এক সালামে পড়া যাবে কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত দুই বৈঠকে এক সালামে আদায় করা যায় *(ছহীহাহ হা/২৩৭-এর ফিক্বহুল হাদীছ)*। যদিও দিন ও রাতের সকল নফল বা সুন্নাত ছালাত দুই দুই রাক'আত করে আদায় করা মুস্তাহাব *(আবুদাঊদ হা/১২৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩২২)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : লোকমান হাকীম 'চারশত বা হাযার নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন' মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-হুসাইন সাগর, দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : কিছু ঐতিহাসিক ও তাফসীর গ্রন্থে লোকমানের চারশত বা চার হাযার নবীর খেদমত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ বক্তব্যটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইসমাঈল হাক্কী বলেন, 'কিছু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, লোকমান বলেছেন, আমি চার হাযার নবীর খেদমত করেছি এবং তাঁদের কথাবার্তা থেকে আটটি কথা নির্বাচন করেছি *(তাফসীর রূহুল বায়ান ৭/৫৫, ৪/২১০)*। তবে এইসব বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : তীব্র গরমের সময় ছেলেরা বাড়ীর মধ্যে অথবা বাড়ীর বাইরে লুঙ্গি পরিধান করে খালি গায়ে থাকতে পারবে কি? মেয়েরা কি বাসার মধ্যে মাহরামদের সামনে ওড়না ছাড়া থাকতে পারবে?

-শাহরিয়ার ইসলাম সবুজ, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রথমত পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত *(ছহীহুল জামে' হা/৫৫৮৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২৭১)*। এক্ষণে যদি লুঙ্গি এমনভাবে পরা হয় যাতে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত যথাযথভাবে ঢাকা থাকে এবং কাপড় পাতলা না হয়, তাহ'লে তাতে দোষ নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৭৩)*। দ্বিতীয়ত মহিলারা মাহরাম পুরুষদের সামনেও দেহের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো ঢেকে রাখবে। তবে মাথা বা হাত মাহরামদের সামনে খোলা রাখতে পারবে *(ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ১১/১৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : চিকিৎসাজনিত বা হরমোনগত কারণে চুল উঠে গেলে টাক মাথায় হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা কি জায়েয? এতে কি আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করা হবে?

-ফিরোয আসীফ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : চিকিৎসার প্রয়োজনে বা চুল পড়ে যাওয়ার ত্রুটি দূর করার জন্য হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা জায়েয। এটিকে আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ এর উদ্দেশ্য নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করা নয়; বরং পড়ে যাওয়া চুল পুনরুদ্ধার করা এবং ত্রুটি দূর করা। শায়খ ওছায়মীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, তা জায়েয। কারণ এটি আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা পুনরুদ্ধার করার এবং ত্রুটি দূর করার অন্তর্ভুক্ত। এটি সৌন্দর্যবর্ধন বা আল্লাহ্র সৃষ্টির ওপর কিছু সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হারিয়ে যাওয়া বিষয় পুনরুদ্ধার ও ত্রুটি দূর করার অন্তর্ভুক্ত' *(ফাতাওয়া বালাদিল হারাম পৃ. ১১৮৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : কট্টর বিদ'আতী বা কুফরী আক্বীদার কোন আলেম কিংবা ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অথবা সমাজ ও দেশে কুরআন-হাদীছের সঠিক কথা ও মাসআলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন হাতে বা মাথায় রেখে আল্লাহ্র নামে কসম করা কিংবা মুবাহালা করা কি জায়েয?

-ডা. পারভেয, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রথমত আল্লাহ্র নামে বা তাঁর গুণবাচক নামে কসম করা যায়। আর কুরআন তাঁর অন্যতম গুণ। সেজন্য কুরআনের কসম করা যায় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১০/২০৭; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃ. ১৫৭)*। কিন্তু কুরআন মাথায় রাখা, হাতে রাখা বা তার উপর হাত রেখে কসম করা কসমের শর্ত বা সুন্নাত নয়। দ্বিতীয়ত মুবাহালা একটি শরী'আতসম্মত বিষয়। কিন্তু এর জন্য কুরআন মাথায় রাখা বা হাতে নেওয়া শর্ত নয় এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে এমন পদ্ধতি প্রমাণিত নয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৬৪৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/২০৩-২০৪)*। 'মুবাহালা' কেবল এমন গুরুত্বপূর্ণ শারঈ বিষয়ে করা যাবে, যে বিষয়ে সংশয় ও হঠকারিতা সৃষ্টি হয় এবং মুবাহালা ছাড়া তা দূর করার কোন কার্যকর উপায় থাকে না। সুতরাং মুবাহালা করার আগে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সংশয়-সন্দেহ দূর করার

চেষ্টা করতে হবে, নছীহত ও সতর্কীকরণ করতে হবে। তাতেও কোন ফল না হ'লে মুবাহালা করা যেতে পারে *(আহমাদ ইবনু ইব্রাহীম, শরহ কাছীদাতি ইবনিল ক্বাইয়িম ১/৩৭)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : অনেক মসজিদে প্রথম জামা'আতের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য প্রথম জামা'আত ছুটে গেলে দ্বিতীয় জামা'আত করতে দেওয়া হয় না; বরং একাকী ছালাত আদায় করতে বলা হয়। উক্ত পদ্ধতি কি সঠিক?

-আব্দুর রহমান, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : প্রথম জামা'আত ছুটে গেলে শুধু জামা'আতে ছালাতের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় জামা'আত নিষিদ্ধ করে মাসবূককে একাকী ছালাত পড়তে বাধ্য করা সঠিক নয়। কারণ প্রয়োজনে বিচ্ছিন্নভাবে মাসবূক জামা'আত করতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, কে এই ব্যক্তির প্রতি ছাদাক্বা করবে এবং তার সঙ্গে ছালাত আদায় করবে? অতঃপর একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে ছালাত আদায় করলেন' *(আবূদাঊদ হা/৫৭৪; মিশকাত হা/১১৪৬, সনদ ছহীহ)*। শায়খ বিন বায বলেন, দ্বিতীয় জামা'আত শরী'আতসম্মত। বরং প্রথম জামা'আত ছুটে গেলে সাধারণ দলীলসমূহের কারণে তা ওয়াজিবও হ'তে পারে। অতএব কোন ব্যক্তি মসজিদে এসে দেখল যে, লোকেরা ছালাত আদায় করে ফেলেছে এবং তার জন্য আরেকটি জামা'আত পাওয়া সম্ভব, তাহ'লে তার জন্য জামা'আতের সঙ্গে ছালাত আদায় করাই শরী'আতসম্মত। আর সে একাকী ছালাত আদায় করবে না *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৬৬, ১৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : সফরে বের হওয়ার আগে বাসায় পরবর্তী ওয়াক্তের ছালাত জমা' ও ক্বছর আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল করীম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ক্বছর করা যাবে না। কারণ ক্বছর করার বিধান সফর শুরু হওয়ার পর প্রযোজ্য; নিজ শহর বা গ্রামের বসতি অতিক্রম করার আগে ব্যক্তি মুসাফিরের হুকুমে প্রবেশ করে না *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৫১৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৯০)*। তবে ঘর থেকেই দু'ওয়াক্তের ফরয ছালাত পৃথক দুই ইক্বামতের মাধ্যমে জমা করে সফরে বের হওয়া ভাল। তাবূকের অভিযানে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এরূপ করেছিলেন *(তিরমিযী হা/৫৫৩; মিশকাত হা/১৩৪৪; দ্র. 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : আমি ইউরোপের একটি হোটেলে চাকুরী করি। সেখানে হালাল ও হারাম উভয় ধরনের খাবার পরিবেশন করতে হয়। এ ধরনের চাকুরী করা কি জায়েয হবে?

-মুহাম্মাদ পাভেল, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : যদি চাকুরীর দায়িত্বের মধ্যে মদ বা শূকরের গোশত বিক্রি, পরিবেশন, বহন কিংবা সংশ্লিষ্ট পাত্র-বাসন ধোয়ার কাজ থাকে, তাহ'লে ঐ চাকুরী করা জায়েয নয়। কারণ এতে পাপের কাজে সহযোগিতা করা হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/১১০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে হোটেলে হারাম খাবার থাকলেও যদি ব্যক্তির দায়িত্ব কেবল বৈধ কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং হারাম কাজে কোন সহযোগিতা করতে না হয়, তাহ'লে শুধু এ কারণে চাকুরী হারাম হবে না। সর্বোপরি হালাল সন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : ১০ই অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। এ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেমিনার, আলোচনা সভা, র‍্যালি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ দিবস পালন করা যাবে কি?

-ড. তরুণ হাসান, রাজশাহী বিশবিদ্যালয়।

উত্তর : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে সেমিনার, আলোচনা সভা, র‍্যালি ও অন্যান্য কর্মসূচি আয়োজন করে বার্ষিক দিবস হিসাবে পালন করা হ'লে তা পরিহার করা উচিত। কারণ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত ঈদ ও বিশেষ দিবসের বাইরে কোন দিনকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট করে বিশেষ উৎসবের দিন বানানোর অনুমোদন ইসলামে নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ২/১৪০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৮৯)*। তবে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, চিকিৎসা ও জনকল্যাণমূলক আলোচনা বৈধ। তাই কোন নির্দিষ্ট দিবসকে বিশেষ মর্যাদা না দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সারা বছর এ ধরনের সেমিনার, আলোচনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা যেতে পারে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১১৯, ৯/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : বিদেশে খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে শূকরের গোশত অথবা বিসমিল্লাহ ছাড়া যবেহ করা হালাল প্রাণীর গোশত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ রাইসান, আমেরিকা।

উত্তর : শূকরের গোশত এবং বিসমিল্লাহ ব্যতীত যবেহ করা গোশত গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা এবং এ কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে...' *(মায়েদাহ ৫/৩; আন'আম ৬/১৪৫)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে সহযোগিতা করলে সে গোনাহগার হবে। কারণ সে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করেছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুত করাতে সহযোগিতাকারী, বহনকারী, যার কাছে তা বহন করে নেওয়া হয়, বিক্রেতা, ক্রেতা, পরিবেশনকারী, পানকারী এবং এর মূল্য ভোগকারীর প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৭৬)*। এদের অধিকাংশই সরাসরি মদ পান না করলেও তা পান করার কাজে সহযোগিতা করে।

একইভাবে, যে অস্ত্র দিয়ে অন্যায়ভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিংবা ফিৎনার যুদ্ধে লড়াই করা হবে, সে উদ্দেশ্যে অস্ত্র বিক্রি করাও নিষিদ্ধ *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২২/১৪১)*। **দ্বিতীয়ত** মুসলিম ও আহ'লে কিতাব অর্থাৎ ইহূদী ও খৃষ্টানদের আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং তা গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ করার চাকুরী করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলো হালাল করা হ'ল। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল' *(মায়েদাহ ৫/৫)*। তবে গোশটি হারাম হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ জানা থাকলে তা খাওয়া বা সরবরাহ করা জায়েয হবে না। **তৃতীয়ত** কোন হালাল প্রাণীর গোশত যবহের সময় বিসমিল্লাহ বলা হয়েছিল কি-না, তা জানা না থাকলে, যদি তা এমন উৎস থেকে আসে, যার যবেহ করা গোশত মূলত বৈধ বলে গণ্য হয়, তাহ'লে তা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া যাবে। একদল লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিছু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। তারা যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েছিল কি-না, তা আমরা জানি না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা বিসমিল্লাহ বলে তা খাও' *(বুখারী হা/২০৫৭; আবুদাঊদ হা/২৮২৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আমার হজ্জের জন্য জমানো টাকার যাকাত প্রদান করতে হবে কি?

-কাযী ছানাউল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া এবং সেই অর্থ এক বছর মালিকানায় থাকা। এই দু'টি শর্ত পাওয়া গেলে যেকোন উদ্দেশ্যে জমানো টাকার যাকাত দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩৮১)*। শায়খ বিন বায বলেন, 'বিবাহ, বাসস্থান নির্মাণ কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত অর্থ নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হ'লে তাতে যাকাত ফরয হবে। সে অর্থ স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা কাগুজে মুদ্রা যে ধরনেরই হোক না কেন। কারণ সাধারণ দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, কোন সম্পদ নিছাব পরিমাণে পৌঁছার পর তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হ'লে তাতে যাকাত ফরয হয়। এ বিধান থেকে কোন বিশেষ প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত অর্থকে বাদ দেওয়া হয়নি *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১২৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : কুকুরের গায়ে কাপড় লাগলে কাপড় অপবিত্র হয়ে যাবে কি? ঐ কাপড় পরিধান করে ছালাত পড়া যাবে কি?

-মাহমূদ আলী, নোয়াখালী।

উত্তর : কুকুরের দেহ বা লোম কাপড়ে লাগলেই কাপড় নাপাক হয়ে যাবে না। বরং বিদ্বানগণ বলেন, কুকুরের লোম ভিজা থাকলে এবং তা কাপড়ের সঙ্গে লাগার কারণে নাপাকী স্থানান্তরিত হ'লে কাপড় নাপাক হবে। সেক্ষেত্রে ঐ স্থান ধুয়ে নিতে হবে। আর কুকুরের লোম শুকনো হ'লে এবং তা শুকনো কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না। তাই এ অবস্থায় ঐ পোষাক পরে ছালাত আদায় করা যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল ফাতাওয়াল কুবরা ৫/২৬৪; মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/৬১৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২০/৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : আমাদের এলাকার ওয়াকফকৃত কবরস্থান ফান্ডে কয়েক লক্ষ টাকা জমা আছে। অন্যদিকে মসজিদের ফান্ডে বর্তমানে কোন টাকা নেই এবং যরূরী ভিত্তিতে কিছু অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় কবরস্থানের টাকা মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?

-আব্দুল আহাদ, হোমনা, কুমিল্লা।

উত্তর : সাধারণত দানের অর্থ সে খাতেই ব্যবহার বা খরচ করতে হয়, যেই খাতের জন্য দাতা দান করেছেন। তবে কবরস্থানের খাতে অতিরিক্ত টাকা থাকলে সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় মসজিদে ব্যয় করা যায়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ওয়াক্বফকারীর নির্ধারিত শর্তকে পরিবর্তন করে তার চেয়ে অধিক কল্যাণকর শর্তে নেওয়া জায়েয; যদিও সময়ের পরিবর্তনে সেই কল্যাণের ধরনও পরিবর্তিত হয়ে থাকে' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪২৯)*। শায়েখ ওছায়মীন বলেন, 'ওয়াক্বফকারীর নির্ধারিত শর্তকে পরিবর্তন করে তার চেয়ে উত্তম ও অধিক কল্যাণকর খাতে নেওয়া জায়েয। তবে শর্ত হ'ল, ওয়াক্বফটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য না হওয়া। যদি ওয়াক্বফটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য করা হয়, তাহ'লে সেটিকে অধিক কল্যাণকর অন্য কোন খাতে ব্যয় করা জায়েয হবে না। কারণ এখানে প্রাপক নির্দিষ্ট। ফলে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার ওয়াক্বফের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। তাই ওয়াক্বফের খাত পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা সম্ভব নয় *(আশ-শারহুল মুমতে' ১১/৩৪, ৯/৫৬০-৫৬১; ফাতওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৭৬-৭৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : আমি আল্লাহ্র নিকট একটি বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম; কিন্তু তা ওয়াদা হিসাবে বলিনি। পরে সে সংকল্প পূরণ করতে পারিনি। এতে কি আমি গোনাহগার হব এবং আল্লাহ কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন?

-সিদরাতুল মুনতাহা, কক্সবাজার।

উত্তর : শুধু অন্তরে কোন নেক আমল করার দৃঢ় সংকল্প করলে এবং কোন কারণে তা করতে না পারলে নযর, মানত বা বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার হিসাবে গণ্য হবে না। তাই তা পূরণ করতে না পারলে মানত ভঙ্গের গোনাহ বা কাফফারা আবশ্যক হবে না *(বিন বায, ফাতাওয়াদ দুরূস)*। তবে মানতের নিয়ত থাকলে তা পালন করতেই হবে। পালন না করলে কাফফারা দিতে হবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার করছি যে, এ বছর আমি হজ্জ করব, তাহ'লে এটি একই সঙ্গে নযর, অঙ্গীকার ও কসম হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি কেউ বলে, আমি যায়েদ-এর সঙ্গে কথা বলব না, তাহ'লে এটি কসম ও অঙ্গীকার হিসাবে গণ্য হবে; নযর হিসাবে নয়। কেননা কোন কসমের মধ্যে যদি নযরের অর্থ থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন ইবাদত বা নেক আমল নিজের উপর আবশ্যিক করে নিলে সেই অঙ্গীকার পূরণ করা তার জন্য অবশ্যিক হবে' *(আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৫/১৪৪)*।

অনলাইনে ভর্তি আবেদন গ্রহণ : ১৫ই নভেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর'২৬ পর্যন্ত। www.amis.edu.bd

ভর্তি পরীক্ষা : ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৬, শনিবার, সকাল ৯-টা।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ২৭শে ডিসেম্বর ২০২৬, রবিবার।

ক্লাস শুরু
২রা জানুয়ারী
২০২৭, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ নার্সারী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- সর্বোচ্চ শ্রেণী কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ।
- মানসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র 'ইয়াতীম বিভাগ'।
- দাওরায়ে হাদীছ, ফাযিল বা অনার্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ১ বছর মেয়াদী তাখাছ্ছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল ফিক্বহ বিভাগে ভর্তির সুযোগ।
- আরবী ব্যাকরণে দুর্বল ও স্কুল থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছর মেয়াদী মা'হাদ বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৯-১৩৪০৫১ (বালক শাখা), ০১৩১৮-৯৬৬০০০ (বালিকা শাখা)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান





রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(বুখারী হা/৪৫০)*।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকী আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 30, Issue 2, November 2026

বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

Bangladesh EYE HOSPITAL Rajshahi Ltd.

চোখের যত্নে বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল 'বাংলাদেশ আই হসপিটাল'-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় ২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।



সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার
এয়ারপোর্ট রোড, আম চত্বর রাজশাহী

মোবাইল :
০৯৬৪৩১২৩১২৩



এম. এস. মানি চেঞ্জার
(M.S. MONEY CHANGER)

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

এখানে সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডলার, পাউন্ড, ইউরো, সউদী রিয়াল, কুয়েতি দীনার, রিংগিট ইত্যাদি এবং পাসপোর্টে ডলার এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

ঠিকানা: গনকপাড়া, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের নিচে, সাহেব বাজার জিরোপয়েন্ট, রাজশাহী।

০১৭২৬-৮৬৮৬৬৬ (অফিস)
০১৭৫৪-১৪৮৪১২

টেলি: ০২৫৮৮৮৫৫৯০২